কিছু স্মৃতি
কিছু ভাবনা

ফিরে দেখা

পূর্ণিমা সেন, এফ ই ৩৩৩

জীবন সায়াহ্ন স্মৃতিচারণার লগ্ন। আমার মতো যারা ''ঘরেও নহে, পাড়েও নহে, যে জন আছে মাঝ খানে' 'তাদের কাছে জীবনের পড়ন্ত বেলায় অতীতের দিনগুলি যেন আরো উজ্জ্বল, চলমান, জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়।

আমাদের পূজার স্যুভেনির 'স্মরণিকার' প্রস্তাবনা মাত্রই আশৈশবশ্রুত বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজ মল্লিক ত্রয়ীর অনবদ্য সৃষ্টি 'মহিষাসুরমর্দিনী' যেন আমার সমগ্র চেতনায় অনুক্ষণ অনুরণিত হচ্ছে।

সেই সুদূর অতীতের দিন গুলিতে মহালয়ার ভোরে পঙ্কজ কুমারের নির্দেশনায় সম্মিলিত প্রতিভাধর গায়ক গায়িকাদের একক, যুগ্ম এবং সমবেত সঙ্গীত, বাণীকুমারের অপূর্ব ভাষ্যে, বীরেন্দ্রকৃষ্ণের অনন্য পাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণ শরতের শিশিরভেজা সোনালীরোদে চারিদিক ছড়িয়ে পড়ত। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও অনঅনুকরণীয় কণ্ঠস্বর যেন আমাদের কাছে দৈববাণীর মত ভেসে আসত।

আকাশবাণীর সঙ্গে ওত প্রোতভাবে যুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ নাটকাভিনয় ও প্রযোজনা করেছেন; ''মেঘদুত'' ছদ্মনামে মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান করেছেন। পরবর্তীকালে বিষ্ণুশর্মা ছদ্মনামে মহিলাদের লেখা গল্প ও কবিতা পাঠ করেছেন। বেতার আলোচনা, চিঠিপত্রের উত্তর দিয়েছেন। এমনকি, কখনো সখনো গান করেছেন, পিয়ানোও বাজিয়েছেন। ''বিরূপাক্ষ'' নাম নিয়ে কৌতুকোজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত অসাধারণ সব রচনার মাধ্যমে বঙ্গ মননে অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এভাবেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ পেয়েছেন এক প্রবাদপুরুষের পরিচিতি।

দশকের পর দশক জুড়ে তাঁর উদাত্ত স্বর্ণকণ্ঠে 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি' যেন দুষ্টদলনী, শুভময়ী মাতৃকাকে বাঙালির প্রাণে প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদের ঐকান্তিক প্রার্থনাকে প্রতিধ্বনিত করে চলেছে অখিল বিশ্বে। তিনি যে আপামর বঙ্গভাষাভাষীদের হৃদগগনে ধ্রুবতারার মত বিরাজিত তারই প্রমাণ জরুরি অবস্থার বৎসর মহালয়ায় আকাশবাণীর নতুন আলেখ্যটির অকাল মৃত্যু এবং সম্পূর্ণ বিলুপ্তি।

যথেষ্ট সুচিন্তিত সুলিখিত এবং সর্বোপরি মহানায়ক উত্তম কুমারের ভাষ্যপাঠ সত্ত্বেও এই আলেখ্যটি আমাদের মনের গহনতম গভীরে সেই নান্দনিকতা, স্মৃতিমেদুরতা ও আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনার আসনটি গ্রহণ করতে পারেনি।

এই নিবন্ধে বঙ্গচেতনায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সজীব উপস্থিতি প্রকাশের প্রয়াস ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। যেহেতু প্রবাসে বাঙালি মাত্রই আরো একটু বেশি বাঙালি তাই বোধহয় আকাশবাণীর মহিষাসুরমর্দিনী যুগ যুগ ধরে আমাদের মোহবিষ্ট করে রেখেছিল। দূরবর্তী স্বদেশ তাদের কাছে প্রাত্যহিকতার ধুলিময়লা আর অতিপরিচয়ের অবস্থার ঊর্ধ্বে এক আদর্শের আধার। সেজন্যই আমার প্রবাসী শৈশবে বাংলার শিল্পকলা, নৃত্য, সাহিত্য, উৎসব আর পশ্চিমবঙ্গের সমার্থক কলিকাতা ছিল যেন 'ইউটোপিয়া', সুদূরের নীলিমা। মহালয়ার প্রত্যুষে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের অপার্থিব কণ্ঠস্বর ছিল আমাদের কাছে সাক্ষাৎ দৈববাণী। সম্মিলিত দেবগণের তেজপুঞ্জে গঠিত দেবীর আবির্ভাব বর্ণনা শুনতে শুনতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। মনে পড়ে তাড়াহুড়ো করে লিখতে বসে যেতাম কোন দেবতা কোন বাহন বা অস্ত্র দিলেন দেবীকে।

কখনো কোন ছবি না দেখার ফলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বহুবছর ধরে আমার কাছে এক কায়াহীন অলৌকিক কণ্ঠ হয়েই

ছিলেন। সাতের দশকের শেষের দিকে মহিষাসুরমর্দিনীর সূত্রেই তাঁর একটি ছবি আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্ভবত 'কলিকাতার কড়চায়' দেখি। কিছুদিন পর কাশীপুর উদ্যানবাটিতে কল্পতরু উৎসবে গেছি। গীতিআলেখ্য শুরু হতে খানিকটা দেরি আছে হঠাৎ দেখি একটু ফাঁকাতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অমনি ছেলেমেয়েকে দুহাতে ধরে ছুট লাগিয়েছি তাঁর দিকে। ঢিপ করে প্রণাম করলাম। দেখাদেখি আমার ছেলে মেয়ে দুজনও তাঁকে প্রণাম করেছে। একটু অবাক হয়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তুমি আমাকে চেনো?' দেমন থত মত খেয়ে বলে ফেললাম, 'উবিব্বাস, আপনাকে চিনতে পারবো না! আপনি তো দ্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র!' বলেই ভীষণ ঘাবড়ে গেছি, কথাটা কেমন খেলো হয়ে গেল না? বিরক্ত হলেন না তো? কিন্তু দেখি, তেমনি স্মিতমুখেই আমার ছেলেমেয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন, 'বড় হও, ভালো থেকো'। ততক্ষণে আমার স্বামী কাছে এসে নমস্কার ও আলাপ পরিচয় করলেন। আমার আনন্দ ও উত্তেজনা এতটাই হয়েছিল যে সেদিন তাঁর অটোগ্রাফ নেওয়ার কথা আমার মাথায়-ই আসেনি।

আক্ষেপ মিটেছিল বছর ছয়েক পর। ছেলেমেয়ের সঙ্গীত শিক্ষক শ্রী হরিমোহন দাশের সৌজন্যে, হুগলির হিন্দমোটরে সঙ্গীতালেখ্য পরিবেশন করতে এসেছিলেন শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাঁদের সঙ্গে মাস্টারমশাই এর ঘনিষ্ঠতা সূত্রে অনুষ্ঠানের পর তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, অটোগ্রাফও পেলাম। কী ভীষণ ভদ্র সৌজন্য স্নিগ্ধ ব্যবহার দুজনেরই! ছোটর কাছে এমনিভাবেই ছোট হতে পারেন বলেই না বড়োরা এত বড়ো!

তারপর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে। এখন ছেলে দূরবাসী, মেয়ে পরবাসী। এই একুশ শতকের মহালয়ার ভোরে আজও শুনি সেই 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি'। বাতাসে ভেসে আসা সেই অপার্থিব কণ্ঠস্বর। চরাচর আপ্লুত হচ্ছে সেই সুরের মায়ায়। সম্মিলিত গ্রহ তারকা নীহারিকার জ্যোতিপুঞ্জে উদ্ভাসিত দেবীমাতা মূর্ত হয়ে উঠছেন মানসপটে।

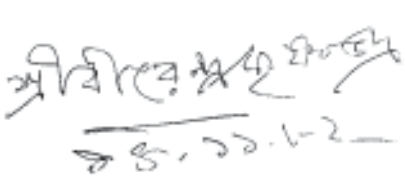

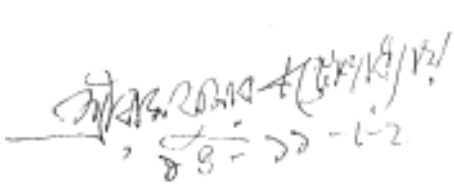

কিছু স্মৃতি
কিছু ভাবনা

ভরা থাক স্মৃতিসুধায়

প্রতিমা মিশ্র, প্রাক্তনী, এফ ই ১৫৯

কবিগুরু বলেছেন —

''আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনই লীলা তব
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবস-বিভাবরী
হ'ল না সারা কত না যুগ ধরি
কেবলই আমি লব।।''

আমার এই অতি তুচ্ছ জীবন ভ'রে সত্য হ'য়ে উঠেছে পরম করুণাময়ের এই অশেষ দানের কথকতা।

আমি, প্রতিমা মিশ্র, মানুষ হিসেবে, ব্যক্তি হিসেবে, যার পরিচয় — 'কিছুই নহি আমি কেহই না'— সেই আমি জীবন স্রোতে ভাসতে ভাসতে তরীখানি ভিড়িয়েছিলাম এফ ই ব্লকের এই অমৃতময় কূলে ১৯৯৩ সালের নভেম্বরে। বহুদিন ধরে ফ্ল্যাটের বাসিন্দা — যখন জীবনের মধ্যভাগে এফ ই ব্লকের নিজের বাড়িতে এলাম, মনে হয়েছিল এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত একক বাড়ির আবাসিক হয়ে বাঁচবো কেমন ক'রে, ভুল ভাঙলো ১৯৯৪ এর প্রাকপুজোর মহিলা সমাবেশে যোগদান করে।

কেউ জানতে চাইলো না, তুমি কোথা থেকে এসেছ। কেউ ভাবলো না এই নবীনা আগন্তুক ঠিক তাদের সমশ্রেণীর কিনা। কেউ প্রশ্ন করল না, আমার স্বামীর কোন পদে অবস্থান। দুহাত বাড়িয়ে দিলেন কৃষ্ণাদি, শ্রীমতি মীরা পাল, শুভ্রা রায় চৌধুরী, আরো কত কত জন। সবাই বুঝি সমস্বরে জানালো, 'তুমি আমাদেরই লোক — আর কিছু নয়।' এফ ই ব্লকের প্রিয়ভূমিতে — 'সে মোর প্রথম পরিচয়।' তারপর দীর্ঘ ৩০ বছর এই এফ ই ব্লকের মাটিতে আমার ফুল হয়ে ফুটে ওঠা, সে এক মনোরম কাহিনি। কত আনন্দ, কত কাজ, কত সঙ্গসুধা, পুজোর নাড়ু পাক থেকে ভোগরান্না, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাদকতা থেকে স্মরণিকার সম্পাদনা, -- জানিনা কেমন করে সামিল হয়ে গেলাম সমস্ত কর্মকাণ্ডে। আমার স্বামী রঙ্গ করে বলতেন — 'আমাকে এখানে ''অমল মিশ্র'' নামে কেউ চেনেন না, চেনে ''প্রতিমা মিশ্রের'' স্বামী বলে।' সত্যি তো আর এত যোগ্যতা আমার ছিল না। এফ ই ব্লক আমাকে বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ ধরিয়ে দিয়েছে দুই হাতের মুঠি ভরে — সে কথা ভুলবো কেমন করে!

পুজো ছাড়াও আমাদের সারা বছরের যাত্রাপথে কত শত বৈচিত্র্যের ডালি সাজানো ছিলো। ছিলো আমাদের ভজন-সভা, সপ্তাহে একদিন সেখানে মেলা; সে তো শুধু ঈশ্বরের আরাধনা নয়, সেখানে সারা পাড়ার সমস্ত মহিলাদের সঙ্গে আত্মিক পরিচয়, সানন্দ মনো-বিনিময়। তারপর গীতাপাঠ, গীতার ব্যাখ্যা, ধর্মপোদেশ — কত কি! কত কিছুর মধ্যে নিজেদের মেলে ধরা। এত আয়োজন কোথায় থাকে! এছাড়া ছিল পাঠচক্র, ছিল মহিলাদের সংস্থা ''সঙ্গী সাথী'', ছিল ''মনসিজ'' সাংস্কৃতিক সংস্থা। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডই ছিল। কোনোটি লোকহিতায়, কোনোটি বা নিজেদের জীবনযাত্রাকে পরিশীলিত করে তোলার সযত্ন অনুশীলন। এই অনুশীলনের যাত্রা পথে আমরা যা আহরণ করেছি তার কোন পরিমাপ হয় না। যে আনন্দ পেয়েছি, তার সীমা নির্ধারণ করা আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীর সাধ্যাতীত।

এফ ই ব্লকের এই জীবন পরিক্রমায় যাঁদের সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়েছি —তাঁদের কথা ব'লে শেষ করবো — এমন সাধ্য

আমার নেই। কৃষ্ণাদি, গীতশ্রী দি, দীপালি দি, ভারতী দি — এরা আমার মনের আসনে চির-আসীনা হয়ে আছেন। আজীবন। এবার কার নাম লিখি, কার কথা লিখি...সবাই যে আমার মন জুড়ে রয়েছে শয়নে স্বপনে, শুভ্রা, শিখা, রেবা, শীলা, তন্দ্রা, বনানী, কুমকুম, মীনা, অঞ্জলি (ঘোষ), রেবা (দত্ত), চন্দনা, রত্না, ভারতী দে, পূর্ণিমা সেন, সুতপা, কাবেরী — এরা সবাই আমার অতি প্রিয় মনের মানুষ, যাত্রাপথের সহযাত্রিনী; প্রতিদিনের জপের মালায় এক একটি মহামূল্য রুদ্রাক্ষের মত গাঁথা হয়ে আছে এদের নাম, যেখানে থাকি 'মনে তাদের নিত্য যাওয়া আসা' কিন্তু এরা ছাড়াও অল্পবয়সী মেয়েরা অনেকে আসতো আমার কাছে ''কাকিমা'' ব'লে ডেকে। বয়সের বাধা তুচ্ছ করে তারা আমার একান্ত বন্ধু হয়ে গ্যাছে, বন্ধু হয়ে আছে; চিরদিন থাকবে। কাকলী, মহুয়া, ঝিলিক, দীপা, সঙ্গীতা আসতো আমার কাছে একান্ত ভালোবেসে। সে ভালোবাসার বাঁধন কোনদিন ছিন্ন হবার নয়। নানা আলোচনায়, ভাষ্য রচনার প্রয়োজনে, অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির কারণে এদের সঙ্গে আমার যোগ, কিন্তু সেই যোগ কখন যে অদৃশ্য এক মায়াডোরের বাঁধনে বাঁধা হয়ে গ্যাছে; জানতে পারিনি। আজ সে মায়াডোরে বিচ্ছেদের টান যদি পড়ে, সে বেদনা বড় অসহ। প্রতিটি কাজের অঙ্গনে যাদের পেয়েছি, তাদের কথাও তো ভুলে যাবার নয়। পার্থ, রাণা, বাসব, কল্যাণ (মুখার্জি), কৃষ্ণেন্দু এদের সবার আমি কাকীমা। প্রতিটি কাজে আমার সাহায্যে এরা দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধুর মত, সন্তানের মত, একই সঙ্গে সহকর্মীর মত। এদের শ্রদ্ধা, এদের ভালোবাসা, এদের সহায়তা আমাকে কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি পদক্ষেপে এক অসামান্য মহিমার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। যার যোগ্য হয়তো আমি ছিলাম না। আরও একজনের নাম এ প্রসঙ্গে বলতেই হয় বিশেষত ঃ স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে এই ছেলেটি তার নিজস্ব কারিগরি এবং শৈল্পিক দক্ষতায় আমাদের স্মরণিকাকে এমন এক অপরূপ সৌন্দর্যের আলোয় আলোকিত করে তুলেছে যে — সে আলোর ছটায় মুগ্ধ হয়েছে সবাই। সেই সময় সেই আলোর ছটা এসে লেগেছে আমারও গায়ে — যা আমার প্রাপ্য ছিল না। শ্রদ্ধাশীল, নম্র, মধুর স্বভাব এই ছেলেটিকে সবাই নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন এতক্ষণে। আমাদের স্বপ্নের স্মরণিকার এই কারিগরের নাম ''তন্ময় শীল''। আরও একজনের কথা অনায়াসে আসা যাওয়া করে এই স্মৃতিচারণে। সে একটি পাগল ছেলে। সে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বয়স্কদের কুশল সংবাদ নিয়ে বেড়ায়। উপযাচক হয়ে নিয়মিত খোঁজ খবর নেয়, যাঁরা তাকে ভালোবাসেন। বিশেষতঃ যাঁরা লেখেন তাঁদের লেখা সে বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করে পত্রিকার অফিসে পৌঁছে দেয়। স্মরণিকা প্রকাশের সময় সে তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে লেখার জন্য অনুরোধ করে বেড়ায়। লোকে হয়তো ভাবে এভাবে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র স্বভাব অর্থহীন। আবার আমার মনে হয় এমন পাগল সর্বত্রই দু একজন থাকলে সমাজ জীবনটা সুন্দর হবে। এই ছেলেটির নাম ''দেবরাজ সেনগুপ্ত''।

এফ ই ব্লক কে ঘিরে স্মৃতির শেষ নেই মধুর — এ যেন 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই'—এর মধুরতম অনুভূতি। আজ ভাগ্যের কোন অভাবিত পরিহাসে এই স্বর্গ থেকে আমি বিচ্যুত। তবু মনে মনে এই প্রাণপ্রিয় ভূমিতেই আমার চির অবস্থান। এফ ই ব্লকের মাটি, এফ ই ব্লকের মানুষ, এফই ব্লকের আকাশ-বাতাস-জলকণা আমার বেঁচে থাকার প্রেরণা। এখানকার মানুষজন আমার প্রাণের মানুষ, পথে চলার সাথী, সকল ব্যথার ব্যথী। ইচ্ছে ছিল এখান থেকেই শেষ বিদায় নেব শেষের সেই দিনটিতে। সে সাধ আমার হলো না পূরণ । সেই অপূর্ণ সাধই হয়তো নতুন কোন জনমে, নতুন পরিবেশে ফিরিয়ে দেবে আমায় আমার এই প্রিয় এফ ই ব্লকের অন্য কোন ঘরে।

তাই কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে জানাতে ইচ্ছে করে আমার শেষ বেলাকার আর্তিঃ-

''আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
সুখ দুঃখের ঢেউ খেলানো'' এই ভূমিটির তীরে।।
''আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে
নূতন প্রেমে ভালোবাসি আবার এই ভূমিরে।''

এফ ই ব্লকের মাটির প'রে আমার স্বতোৎসারিত প্রণাম। চিরপ্রণত হৃদয়ে বলি —

এ মাটি আমার 'স্বর্গাদপিগরীয়সী'।

কিছু স্মৃতি
কিছু ভাবনা

বিয়ে বাড়ি তোলপাড়

তন্দ্রা গোস্বামী, এফ ই ২৯৭

তারিখটা ছিল দুহাজার পাঁচ সালের একুশে এপ্রিল। মেজর জেনারেল শিবনাথ মুখার্জি ও আমার বান্ধবী তুষারকণার ছোট মেয়ে লীনার বিয়ের অনুষ্ঠান।

তুষারকণা অর্থাৎ টুকুর বড় দুই মেয়ে উমা ও রুমার বিয়ে হয়েছিল রুড়কিতে। শিবুদা তখন আর্মিতে মেজর জেনারেল ও রুড়কিতে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কমান্ডেন্ট। অনেক বার বললেও আমার কিছু অসুবিধার কারণে ওদের দুজনের বিয়েতে আমাদের আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সেজন্য টুকুর অভিমান কিছু কম হয়নি।

এবার অনেক আগে থেকেই টুকু লীনার বিয়ের দিনক্ষন জানিয়ে রেখেছে। আমরা দুজনে সমস্ত বাধা সরিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলাম দিল্লীতে গিয়ে লীনার বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য। পাত্র লীনার নিজের পছন্দ করা। ছেলেটি পাঞ্জাবী, সেজন্য প্রথম থেকেই টুকুর মোটেই মত ছিল না। যদিও শিবুদা মেয়ের মতের বাইরে যেতে চাননি। অনেক টানা পোড়েনের পর দিল্লীতে বিয়ের আসর বসবে ঠিক হ'ল। ছেলেটি বম্বেবাসী।

বিশে এপ্রিল সকালে আমরা দুজনে রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লী পৌঁছে গেলাম। টুকু স্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে ছিল। যথা সময়ে বিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেখলাম বাড়ি বেশ সরগরম।

ছোট বোন বুনি তার পরিবার, দেবর সোমনাথবাবু, অনুরাধা ও ওদের মেয়ে মুন্নি, সপরিবারে ননদ, উমার শ্বশুর শাশুড়ী চ্যাটার্জী বাবু ও মঞ্জুদি, মণি মা- যিনি টুকুর সমস্ত ধর্মীয় নিয়মকানুন ও পুজো ইত্যাদি গুছিয়ে সামলান, সাথে দুজন সাহায্যকারী। এরা সকলে এসে পৌঁছে গিয়েছে। আত্মীয় স্বজন ছাড়া একমাত্র আমরাই বন্ধু যে বাইরে থেকে বিয়েতে যোগদান করতে এসেছি।

অনেকটা এলাকা জুড়ে আর্মি কলোনি, যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু দোতলা বাড়ি। এ রকম একটা বাড়ির একটা ফ্ল্যাট আমাদের থাকার জন্য দেওয়া হ'ল।

স্নান সেরে আমরা পৌঁছে গেলাম মূল ভবনে, যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে তারই গোছগাছ চলছে। জল খাবার পর্ব শেষ হলেও আমাদের জন্য লুচি তরকারি আর মিষ্টি রাখা ছিল। খাওয়ার পর হল ঘরে এসে দেখলাম সেখানে মহিলাদের গুলতানি চলছে। সকলেই আমার পূর্ব পরিচিত। টুকু আমার হাত ধরে ওর পাশে ফরাসের উপর বসাল। টুকুর ছোট বোন বুনি চায়ের জন্য তাগাদা দিল।

শিবুদাকে দেখলাম ব্যস্ত হয়ে কিছু মিলিটারি জওয়ান কে নানা রকম নির্দেশ দিচ্ছেন। শিবুদা নিজে নিরামিষ খান ও কোনরকম নেশা এমনকি চা কফি ইত্যাদিও খান না। তবু দেখলাম আগামীকালের অতিথিদের জন্য দু-তিন পেটি কড়া পানীয় স্টোর রুমে ঢুকল। কাজের থেকে কাজ করার জনবল বেশি থাকায় বাড়ির সদস্যদের কোন কাজ আছে বলে মনে হ'ল না। উমা ও রুমা, টুকুর দুই মেয়ে লীনাকে নিয়ে সেলুনে বেরিয়ে গেল। আমরা সবাই গোল হয়ে বসে অনুরাধা আর ওর মেয়ে মুন্নির গান শুনতে লাগলাম। মুন্নির গানের গলা অসাধারণ সুন্দর।

বিকেলে সংগীতের অনুষ্ঠান হবে সেজন্য মস্ত একটা জায়গা সুন্দরভাবে সাজানো হচ্ছে। বড় দুই জামাই, তাদের বাড়ির লোক, কিছু স্থানীয় বন্ধু, বাড়ির সকলে সন্ধ্যায় সেখানে উপস্থিত হলাম।

হঠাৎ আমার কর্তা প্রবীর বলল তার মাথা ঘুরছে। সবাই ব্যস্ত হয়ে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। প্রেশার ঠিক আছে। সম্ভবতঃ স্পন্ডেলোসিস থেকে মাথা ঘুরছে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই তবু তার জন্য একটা হুইলচেয়ার এল। অনেক রাত পর্যন্ত নাচ-গান হৈ হুল্লোড় চলল।

লীনাকে বলা হয়েছিল, কাল বিয়ে সেজন্য আজ আর হবু বর কুনালের সাথে দেখা করা চলবে না। টুকুর নন্দাই বেশ কড়াধাতের মানুষ। তিনি সমস্ত দিকেই নজর রাখছেন। কে যেন এসে জানিয়েছিল কুনাল এসে বাইরে লীনার সাথে কথা বলছে। শান্তিবাবু টুকুর নন্দাই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বাইরে যেতে গিয়ে কার্পেটে পা আটকে দড়াম করে আছাড় খেলেন। চেয়ারের কোনা লেগে মাথায় রক্তারক্তি কান্ড। হৈচৈ শুনে কুনাল এসে শিবুদা ও টুকুকে নিয়ে ওনাকে গাড়িতে তুলে সোজা হাসপাতাল। সেখানে মাথায় সেলাই পড়ল আর পা মুচকে যাওয়ার জন্য ক্রেপ ব্যান্ডেজ বেঁধে সোজা বিছানায়।

পরদিন ভোরবেলা দধিমঙ্গল হওয়ার পর মণি মা যা কিছু নিয়ম পরবর্তীতে আছে তার জন্য তার সাথে আসা দুজন সহকারীকে নিয়ে গোছাতে বসে গেলেন। গায়ে হলুদ নিজের বাড়ির তেল হলুদ দিয়েই সাঙ্গ হ'ল। কারণ বরপক্ষ গায়ে হলুদ কি সেটা জানে না।

বিয়ের দিন বেলা এগারোটা। এদিকে মা, মাসি, কাকী পিসিদের কোন কাজ নেই। কারণ এখানে কাজের লোক উদ্বৃত্ত। সবাই মিলে গান গল্প আড্ডা আর ঘন ঘন চা-এর সাথে দিন গড়িয়ে চলেছে।

সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চড়ে বড় এলো। সাথে নাচতে নাচতে ব্যান্ড বাজিয়ে বরযাত্রীরা। আলোর রোশনাইয়ে চারিদিকে ঝলমল করছে।

আমরা বরণডালা সাজিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে উলু দিয়ে জামাই বরণ করতে গেলাম।

শঙ্খ ও উলুধ্বনীর শব্দে বরপক্ষ বোধহয় ঘাবড়ে গিয়েছিল। সব বাজনা ও নাচানাচি হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা জামাই বরণ করে ঘরে নিয়ে এলাম।

সপ্তপদী, মালাবদল ইত্যাদির শেষে বর কনেকে বসানো হলে দেখলাম প্যান্ট শার্ট পড়া শাশুড়ি-জা-ননদ সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে আমাদের নিয়ম দেখছে। তাদের চেয়ার টেনে বসানো হ'ল।

টুকুর দুই মেয়ে উমা ও রুমা এগিয়ে গিয়ে আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানের নিয়ম রীতি ওদের বোঝাতে লাগল।

পরদিন দুপুরে বর কনে বিদায় নিয়ে বোম্বে রওয়ানা হলে আমরা সবাই লেগে পড়লাম গোছগাছ করতে। বৌভাত হবে বোম্বেতে। আজ রাতে ট্রেনে আমরা কন্যাযাত্রীরা সবাই বোম্বে রওয়ানা হয়ে যাব।

চল্লিশজন কন্যাযাত্রী তাদের অন্তত একশোটা লাগেজ, এসব কিছু গুনে গুছিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রধানত বড় জামাই গুলু ও মেজ জামাই অঙ্কুশ কে তাদের সাথে আছে তিনজন করিৎকর্মা আর্মি জওয়ান। আমি হুইল চেয়ার টেনে আমার কর্তাকে নিয়ে ট্রেনে ওঠালাম। সম্পূর্ণ বগিটাই আমাদের রিজার্ভ করা টুকুর দেবর, শিবুদার মেজভাই সোমনাথবাবু রেলওয়ের বড় অফিসার। সব রিজার্ভেশন বুকিং করার দায়িত্ব ছিল সোমনাথবাবুর উপর। সমস্ত মালপত্র গুনে গুছিয়ে তোলার পর হুইলচেয়ার একজন জওয়ানের জিম্মায় দিয়ে আমরা সবাই ট্রেনে উঠে পড়লাম।

উমার শ্বশুর চ্যাটার্জি বাবুর হাই প্রেসার ও একটু হার্টের প্রবলেম আছে। সেজন্য ট্রেনে উঠে ওনাকে আগে সিটে শুইয়ে দেওয়া হল আমি ওর স্ত্রী মঞ্জুদির পাশে বসে পড়লাম।

গয়াতে ওঁদের একটা স্কুল আছে অনেক রাত পর্যন্ত মঞ্জুদির কাছে স্কুলের গল্প শুনছিলাম।

পাশের সিটে টুকুর জা অনুরাধা বসেছে। উল্টোদিকের আপার বাংকে সোমনাথ বাবু। মোবাইলে অনুরাধার সঙ্গে মেসেজের মাধ্যমে প্রেমালাপ চলছে। দুজনের হাসি দেখে আমার সেটাই মনে হ'ল।

টুকুর মেজ জামাই অঙ্কুশ পাঞ্জাবের ছেলে। ওর বাড়ির কেউ আমাদের সাথে যাচ্ছে না। হয়ত আকাশপথে যেতে পারেন, সেটা জানি না।

আমাদের রেল বগির সামনের দিকে আমরা বড়রা আর পিছনের দিকে ছোটরা। শিবুদা এখানেও ঘুরে ঘুরে দেখছেন সবার সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা কারো কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি।

পিছনের অংশের ছেলেমেয়েরা খুব হই হই আনন্দ করে যাচ্ছে। সেটা মাঝে মাঝে ওদের হাসি ও চিৎকারে মালুম হচ্ছে।

সকাল ১০ টা নাগাদ পৌঁছে গেলাম বম্বে। আবার একশো লাগেজের গুনে গুনে অবতরণ, সাথে আমাদের মত কিছু জীবিত লাগেজের।

স্টেশনে একটা মিলিটারি গাড়ি ওয়ানটন অপেক্ষা করছিল। সেটাতে সবার সমস্ত লাগেজ তোলা হ'ল। জওয়ানরা সেখানে উঠে গেল। আমরা একটা ট্রাভেলারের মতো গাড়িতে উঠে রওয়ানা হলাম।

আমাদের এবার গন্তব্য নেভির ''ঘায়েল'' নামক একটা অফিস কাম গেস্ট হাউস। আরব সাগরের ধারে খোলামেলা এই গেস্ট হাউস ও সাথে নেভির অফিস। রেস্ট্রিকটেড এরিয়া। শিবুদা নিজের আই কার্ড ও বুকিং ডকুমেন্ট দেখাবার পর আমাদের গাড়ি ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেল।

পথ থেকে বেশ কিছু সিঁড়ি নিচে নেমে এই গেস্ট হাউস। পাশে নেভির অফিস। আরও কিছু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলে আরব সাগরের জল স্পর্শ করা যায়। সমুদ্রের খানিকটা অংশকে বোল্ডার দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। যেখানে নেমে স্নান করলে কোন রকম বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ঢেউ কিংবা জলের গভীরতা নেই।

এই গেস্ট হাউসের দুটো ভাগ আছে। প্রতিটি অংশে দুটো করে বড় হলঘর আছে। হতে পারে এগুলো কনফারেন্স রুম। আমরা বড়রা একটা অংশে এবং ছোটরা অন্য অংশে গিয়ে উঠলাম। আগেই বলা ছিল, সেজন্য চেয়ার টেবিল সরিয়ে মেঝেতে তোষক চাদর দিয়ে সাজানো হয়েছে। কয়েকটা চেয়ার ও একটা সিঙ্গল খাট একধারে রাখা আছে। অন্য ঘরে সোফা ধার দিয়ে রাখা আছে আর তোষক, চাদর, বালিশ বিছানা। পিছনে রান্নাঘর, খাওয়ার জায়গা। ঘরের লাগোয়া পরপর চারটি স্নানাগার ও ওয়াশরুম। পরিপাটি ব্যবস্থা দেখে সবার মন ভালো হয়ে গেল।

অন্যদিকে আমরা দেখিনি তাই সেদিকের কি ব্যবস্থা বলতে পারব না।

স্নান সেরে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম ছেলেমেয়েরা সমুদ্রে নেমে দাপাদাপি করছে। ঘরের বাইরে প্রচুর বালি আর দমকা হওয়ার মাতামাতি তাই বারান্দায় উঠে এলাম। আজ সন্ধ্যায় লীনার রিসেপশান। আমরা সেখানে যাব, তার আগে খাওয়া দাওয়া করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। রাতে এখানে ফিরে এসে কাল সকালে আমরা সবাই যে যার গন্তব্যে চলে যাব।

লীনাকে খুব সুন্দর লাগছিল। ওকে খুব খুশি দেখে আমরা সবাই খুব আনন্দ পেলাম। সেই রাতটা সবাই খুব মজা করে কাটালাম।

পরদিন আমাদের উড়ান সকাল সাড়ে আটটায়। এখান থেকে বিমানবন্দর যেতে শিবুদা জানালেন পৌনে এক ঘন্টা সময় লাগবে। সেই মতো তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। শিবুদা আর টুকুও সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছে মঞ্জুদি ও চ্যাটার্জিবাবুও দেখলাম উঠে বসে আছেন। সবার প্রথমে আমাদের কলকাতায় ফেরার টিকিট, সেজন্য প্রস্তুতিটা সবার আগে আমাদের। আমি ব্যাগ ওষুধ ইত্যাদি যখন গোছাতে ব্যস্ত তখন আমার

কর্তাটি চ্যাটার্জিবাবুর সাথে নানান মজার মজার গল্প করছে আর দুজনে মাঝে মাঝে হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ছে।

শিবুদা আগেই গাড়ি বলে রেখেছিলেন। গাড়ি আসতেই আমরা সবার থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম। প্রবীর টিকিটটা দেখতে চাইল। বললাম, চল, গাড়িতে দেখাব। আমার ব্যাগে টিকিট আছে। আমার হাতব্যাগটা খাটে প্রবীরের পাশে রেখে কিচেনে জল খেতে গেলাম। সেই অবসরে প্রবীর আমার ব্যাগ থেকে টিকিট বের করে দেখেছে।

কিচেন থেকে ফিরে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে আমরা গাড়িতে উঠে পড়লাম। শিবুদা, টুকু, বুনি গাড়ি পর্যন্ত এল আমাদের বিদায় জানাতে।

ভোরের বাতাস বেশ মনোরম। এক পাশে গাছের সারি, অন্যপাশে মাছ শুকোতে দেওয়া হয়েছে। শুটকি মাছের বিকট গন্ধে সকালের ভালোলাগাটা উধাও হয়ে গেল। কিছুটা যাওয়ার পর আমার হঠাৎ মনে হ'ল ফ্লাইট টাইম টা আর একবার দেখি। ব্যাগ খুলে টিকিট বের করতে গিয়ে টিকিট পেলাম না। ব্যাগের সব কিছু নামিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে কোথাও টিকিট পাওয়া গেল না!

আমার সমস্ত শরীর দিয়ে একটা হিমস্রোত বয়ে যাচ্ছে, কোথায় গেল টিকিট! এবার কি হবে? আমি এখন কি করবো? ফিরে গেলে ফ্লাইট পাব না। আমার কাছে এখন যা টাকা আছে তাতে দুজনের আবার টিকিট কাটা যাবে না। আজ সকালে যে যার গন্তব্যে চলে যাবে, ঘায়েল ফাঁকা করে। এখন ফিরে গেলেও আমরা ভিতরে ঢুকতে পারবো না। আমার কাছে মোবাইলও নেই। প্রবীরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'টিকিট তুমি আমার ব্যাগ থেকে বের করেছিলে। কোথায় রাখলে?' ওর সোজা উত্তর, 'তোমার ব্যাগে!' 'কিন্তু আমার ব্যাগে তো নেই।' 'তা আমি কি জানি।' ওর সমস্ত পকেট খুঁজে দেখলাম কোথাও টিকিট নেই। আমি দরদর করে ঘামছিল কি করবো এখন! টুকুরা কি এখন আছে না চলে গিয়েছে? বম্বেতে আমার পরিচিত আর কেউ থাকে না। কাকে বলব, কোথায় যাব? ড্রাইভারকে বললাম গাড়ি ঘোরাতে। 'জোর চালাও টিকিট পাচ্ছি না' কোনক্রমে বুঝিয়ে বলতেই সে গাড়ি ঘুরিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব জোরে গাড়ি নিয়ে ছুটতে শুরু করলো। আমার এই ধারণা স্পষ্ট যে কোন ভাবেই আর আমাদের নির্দিষ্ট উড়ান ধরতে পারবো না। আমার মাথা তখন আর কাজ করছে না। হাত-পা কাঁপছে। বমি পাচ্ছে। দুচোখ ছাপিয়ে জলের ধারা বইছে। ''ঘায়েলে'' ঢুকতে না পারলে, শিবুদারা চলে গেলে কি করব, সেটা আর ভাবতে পারছি না।

গেটে পৌঁছলে গাড়ি যথা নিয়মে আটকে দিল। গাড়ি থেকে নেমে বললাম, 'একটু আগে বেরিয়েছি' ফ্লাইটের টিকিট ফেলে গিয়েছি। আমাকে ভিতরে গিয়ে টিকিট আনতে হবে দেরি হলে ফ্লাইট পাবো না আমার উদভ্রান্ত চেহারা, দু চোখের জল, কাঁপুনি দেখে ওদের বোধহয় মায়া হ'ল। ওখান থেকে ফোন করল ভিতরে এবং আমাকে ঢোকার পারমিশন দিল তবে অবশ্যই আই কার্ড দেখে।

দৌড়ে পৌঁছে গেলাম ঘরে, সবাই যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, গাড়ি এসে গিয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে শিবুদা কে বললাম টিকিট পাচ্ছি না। শিবুদা, টুকু, বুনি, অনুরাধা, মঞ্জুদি সবাই মিলে ঘর তোলপাড় করেও কোথাও টিকিট পাওয়া গেল না। মেঝেতে পাতা তোষক বালিশ চাদর উল্টেপাল্টে ছুঁড়ে ফেলে কোথাও টিকিট নেই। আমি অঝোরে কেঁদে চলেছি। এখন টিকিট পেলেও ফ্লাইট আর কিছুতেই পাওয়া যাবে না। সবাই তো চলে যাবে তাহলে আমরা কোথায় যাব!

আমাদের হট্টগোলে উমা রুমা গুলু অঙ্কুশ চলে এসেছে। ওরাও খোঁজাখুঁজি করছে। প্রবীর অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছে এক কোনায়।

শিবুদা কি মনে করে চ্যাটার্জি বাবুর দাড়ি কামানোর ব্যাগ খাটে রাখা ছিল তার চেন খুলতেই টিকিট বেরিয়ে পড়ল। প্রবীর আমার ভেবে ওনার দাড়ি কামানোর ব্যাগে চেন

টেনে টিকিট ঢুকিয়েছে।

টিকিট পেয়েই শিবুদা চিৎকার করে উঠলেন 'পেয়েছি'। চলুন শিগগিরি, এখনো হয়তো ফ্লাইট পাওয়া যেতে পারে। তখনও আমি বলতে পারলাম না যদি না পাই তবে আমার কাছে যে টাকা আছে তাতে দুজনের টিকিট কাটা যাবে না। দৌড়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। ঝড়ের গতিতে গাড়ি আমাদের বিমানবন্দরে পৌঁছে দিল। তখন আমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছি যে ওর মাথা ঘুরছিল। দু হাতে দুটো ব্যাগ আর কাঁধে কেবিন ব্যাগ নিয়ে দৌড়ে ঢুকে পড়লাম বিমানবন্দরের ভিতর। দেখলাম কাউন্টারে বিরাট লাইন। একটি এয়ারলাইন্সের মেয়েকে সামনে পেয়ে টিকিটটা দেখিয়ে জানতে চাইলাম ফ্লাইট আছে না চলে গিয়েছে? টিকিট হাতে নিয়ে দেখে মেয়েটি জানালো এই ফ্লাইট তো ক্যানসেল হয়ে গিয়েছে। পরে ফ্লাইট পাবেন দু ঘন্টা পরে। হঠাৎ যেন কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না, নাকি বিশ্বাস করতে পারলাম না। আবার জানতে চাইলাম এই ফ্লাইট ক্যানসেল হয়েছে? পরের ফ্লাইটে আমরা যেতে পারব? মেয়েটা কিছুটা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ পারবেন'।

উফ কী শান্তি! আবার যেন আমার সমস্ত ধমনী বয়ে রক্ত চলাচল শুরু করল। ঠান্ডা হাত-পা আবার উষ্ণতা ফিরে পেল। এই ছোট্ট 'হ্যাঁ' কথাটার মধ্যে যে কত সান্ত্বনা, কত শান্তি! এত আনন্দ আমি কতকাল পাইনি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলেও একটু আগে আমি দরদর করে ঘামছিলাম ঠকঠক করে কাঁপছিলাম, ঝ রঝ র করে কাঁদছিলাম।

ধীরে সমস্ত লাগেজ জমা করে এক বোতল জল কিনে ঢকঢক করে আধ বোতল জল শেষ করে ধপাস করে সামনে যে চেয়ার পেলাম সেখানে বসে পড়লাম।

আরও দু'ঘণ্টা! নিজেকে সামলাবার দু'ঘণ্টা, ভালোলাগার দু'ঘণ্টা, অর্থাৎ অনেক অনেক আরও অনেক সময়।

"পরীক্ষায় পাশ করাই যেখানে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের স্থান কোথায়? পরীক্ষায় পাশ করিবার এই রূপ হাস্যকর উন্মাদনা আর কোন দেশে দেখা যায় না। আর পাশ করিয়াই সরস্বতীর নিকট চির বিদায় গ্রহণ — শিক্ষিতের এইরূপ বাসনা ও মনোবৃত্তি আর কোন দেশেই নাই। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি — ভিতরের রত্নরাজি ফিরিয়াও দেখি না।''

— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

কিছু স্মৃতি
কিছু ভাবনা

পনেরোই অগস্ট, উনিশশো সাতচল্লিশ সেই অবিস্মরণীয় দিনটি

গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, এফ ই ৯২

ভারতের জনজীবনে ১৫ই অগস্ট একটি গৌরবজ্জ্বল দিন। প্রতিবছরই দেশের সর্বত্র পতাকা উত্তোলন, সেনাবাহিনী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কুচকাওয়াজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে দিনটি যথাযোগ্য মর্য্যাদায় পালিত হয়। কিন্তু ১৯৪৭-এর ওই দিনটির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-উচ্ছ্বাস-উষ্ণতার সঙ্গে এ-সব দিনের তুলনা চলে না। সুদীর্ঘ -- প্রায় দ্বিশতকের ঔপনিবেশিক শোষণ ও দুঃশাসন মুক্ত হয়ে সমগ্র দেশবাসীর রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে, ঐ দিন ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সমাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

আমার বয়স তখন সবেই দশ পেরিয়ে এগারো — বাল্য থেকে কৈশোরে উত্তরণ। সে বয়সে অন্যদের মানসিকতা জানা বা বোঝ বার ক্ষমতা ছিল না, সে কারণেই শুধু নিজের অনুভব ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করছি। এখন যেমন স্কুল-কলেজে একটা দায়সারা গোছের পতাকা উত্তোলন করে ছুটি দেওয়া হয়, অনেক প্রতিষ্ঠানে সেটুকুও হয় না, দিনটি ছুটির দিন হিসেবেই গণ্য হয়, প্রথম দিনটি কিন্তু তা হয়নি। আমাদের স্কুলে অনেকদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। এটা ঠিকই যে পড়াশুনা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল যদিও আমরা, শিক্ষিকারা নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছিলাম। বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল — নাচ -গান-আবৃত্তিতে পারদর্শী মেয়েদের নিয়ে দিদিরা রোজ তালিম দিচ্ছিলেন। অন্যত্র মেয়েরা নানা দলে ভাগ হয়ে রঙিন কাগজ কেটে শিকল বানাচ্ছে, কেউ বা বানাচ্ছে পতাকা। সবই ত্রিবর্ণরঞ্জিত। নানাভাবে নিজেদের শিল্পকর্ম দিয়ে স্কুলবাড়ীটিকে সাজিয়ে তোলার প্রয়াসে ব্যস্ত সবাই — ছাত্রী থেকে শিক্ষিকা।

গানের জন্য বাছাই হয়েছিলাম আমি, দিদিদের করুণা দৃষ্টিতে একক ও সমবেত অনেক গানে গলা মেলাবার সুযোগ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলালদের দেশাত্মবোধক প্রচুর গান শেখা হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি হারিয়ে ফেলা এক প্রাণবন্ধুর কথা ভীষণভাবে মনে পড়ছে। সে ছিল কল্যাণী পাল, পরবর্তীকালে নজরুল পরিবারের সমাদৃতা বধূ --- কল্যাণী কাজী। আমার সহপাঠী, আবার সংগীতপ্রীতিতেও আমরা একাত্ম ছিলাম। সারা দেশেই তো তোড়জোড় চলছিল মহাসমারোহে দিনটি পালন করার জন্য। অল ইন্ডিয়া রেডিওর (তখন আকাশবাণী নাম হয়নি) কলকাতা কেন্দ্রে শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ কুমার মল্লিকের পরিচালনায় সংগীত শিক্ষার আসরটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। প্রতি রবিবার বেলা দশটায় আমরা কাগজ-পেন্সিল নিয়ে রেডিওর সামনে বসতাম। এই সুযোগে তাঁর কাছ থেকেও দেশাত্মবোধক গান শেখা হল, মনে আছে 'জয় হোক, জয় হোক, নব অরুণোদয়' আর 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' গান দুটি তার অপূর্ব শিক্ষণরীতিতে শিখেছিলাম।

যে স্কুলে আমি পড়তাম সেটি ছিল সে সময়কার উত্তর কলকাতার একটি নামী স্কুল — বীণাপাণি পর্দা গার্লস হাই স্কুল, নীলমণি মিত্র স্ট্রিট ও বিডন্ রো-এর সংযোগস্থলে ছিল স্কুল বাড়িটি। আমার পিসতুতো দিদি, আমার বোন ও আমি — ১৯৪৭ এ আমি ও দিদি ক্লাস সেভেনে ও বোন ফাইভে পড়ত। তখন স্কুলে ইউনিফর্ম চালু ছিল না, পরিচ্ছন্ন এবং বাহারি-চটকদার নয় এমন ফ্রক পড়ে সবাই স্কুলে যেতাম। মেয়েরা ১২-১৩ বছরের হলেই বাড়ি থেকেই শাড়ি পরানো হতো। স্কুলে আলাদা কোন নিয়মের দরকার ছিল না। চোখে-মুখে চুল ছড়িয়ে কেউ যেত না, সবারই

চুল রিবন বা ক্লিপ দিয়ে বাঁধা থাকত। সেদিনও মেয়েরা সবাই সুদৃশ্য, পরিচ্ছন্ন বেশে মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো-মোজা পর্যন্ত পরিপাটি, ফিটফাট। আমরা তিন বোন স্কুলে ঢুকতেই একটা আলোড়ন উঠল আমাদের পোশাক দেখে। পরিকল্পনাটা কার — আমার মায়ের না বাবার, খবর নিইনি। মনে হয় যৌথ। ফরহাদ দর্জি ধবধবে সাদা খদ্দরের ফ্রক তৈরী করে দিয়েছিল। আমার মা পতাকার তিন রঙের রঙিন রেশমী সূতোর লেশ নিজের হাতে বুনে তিনটি জামার হাত ও গলা অলংকৃত করেছিলেন। সবার মাথাতেই ত্রিবর্ণরঞ্জিত রিবন, আমাদেরও।

মেয়েদের তৈরি করা অলংকরণ-সামগ্রী দিয়ে স্কুলের ঘর-বারান্দা পরিপাটি করে সাজানো — বাড়িটি অপরূপ মনোহারী রূপ নিয়েছে। প্রধান দরজার দুপাশে মঙ্গল ঘট— 'আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে' দেশ ও দেশ জননী তখন আমাদের কাছে একাকার। স্বাধীনতা কি, কোন বন্ধন থেকে মুক্তি, এসব চিন্তা যখন মনে ভীড় না করলেও একটা অসাধারণ কিছু ঘটতে চলেছে যা আমাদের সবার পক্ষেই গৌরবের — এই বোধটা দৃঢ় হয়েছিল। দেশাত্মবোধের আবহে আমরা বড় হয়েছি, তা আমাদের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত ছিল। জাতীয় বা স্বদেশ-সংগীত আমরা, ছোটরা সবাই গাইতাম। 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর হও উন্নত শির — নাহি ভয়', 'বল বল বল সবে শতবীণা বেণু রবে' এসব গান কবে কার কাছে শিখেছি জানিনা। মনে হয় জ্ঞান হওয়া থেকেই শেখা হয়ে গিয়েছিল। 'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি' গানটির শেষ পঙক্তি গাইবার সময় কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হত না, এমন ছেলেমেয়ে বোধহয় তখন একটিও ছিল না। ঠিক তেমনই 'বল বীর, বল উন্নত মম শির! শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!' বই দেখে মুখস্ত করতে হয়নি।

আমাদের পরিবারে অবরোধ বেশ কঠোর ছিল। সদর দরজা পার হয়ে রাস্তায় পা দেওয়ার স্বাধীনতা ছিল না আমাদের স্কুল-বাস বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালে তাতে উঠে স্কুলে যেতাম, সেইভাবেই স্কুল থেকে ফিরতাম। তা সত্ত্বেও কে বা কারা আয়োজন করেছিলেন জানিনা -- আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে দত্তদের বাড়ির গেটের মধ্যে খোলা জায়গায় বিকেল বেলায় পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের জড়ো করে কুচকাওয়াজ করানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। দাদার সঙ্গে আমরা তিন বোনও তাতে যোগ দেবার অনুমতি পেয়েছিলাম। এ ঘটনাটা ৪৭ সালের আগেকার, মনে হয় ৪৫-৪৬ সালে। কে নির্দেশ দিতেন তাও মনে নেই, তবে নির্দেশমত আমরা attention বা stand-at-ease -এর ভঙ্গিতে দাঁড়াতাম, quick March নির্দেশ পেলে দুই হাত দুলিয়ে মাথা উঁচু করে left-right করে এগিয়ে যেতাম halt নির্দেশ আসা পর্যন্ত। শেষ হলে সামনে উত্তোলিত পতাকা মনে করে salute করে তাকে অভিবাদন জানানো হতো। মার্চ করার সময় সমবেত কণ্ঠে নজরুলের 'চল চল চল, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' বা 'আমরা শক্তি, আমরা বল, আমরা ছাত্রদল' গান গাওয়া হত। অনুষ্ঠানের শেষে কাকা বা দাদাদের কেউ স্বামীজীর 'স্বদেশ মন্ত্র' আবৃত্তি করতেন, কোনদিন বা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' বা 'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে' শুনে শুনে ছোটবেলাতেই এগুলি আমাদের শেখা হয়ে গিয়েছিল। 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা ...আমার জন্মভূমি' গানটি সমবেত ভাবে গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ হত। পরিণত বয়সে এসে যখন সুভাষ চর্চা করেছি, তখন দেখেছি তিনি প্রিয় বন্ধু দিলীপ কুমার রায় কে লিখেছেন, '' 'ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি' — কি সুন্দর কথাই না লিখেছেন তোমার বাবা।" এ তো আমাদের সবারই মনের কথা। প্রসঙ্গতঃ সুভাষচন্দ্রের সামরিকতাবাদ ভারতের মধ্যবিত্ত মন কে কতটা প্রভাবিত করেছিল, কুচকাওয়াজ ইত্যাদি তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। স্মর্তব্য, দেশে তখন আপাত বিরোধী সরকার ও কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে 'অহিংসার' ব্যাপক প্রচার চলছে। তিনি কেন বিদেশে, সেখানে তাঁর কর্মকাণ্ড বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকলেও নেতাজী যে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কান্ডারী তা বুঝে গিয়েছিলাম। ব্রিটিশ আমাদের পরম শত্রু, তাদের শত্রু আমাদের মিত্র, এই বোধ নিয়ে দল বেঁধে গাইতাম 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি, বোম ফেলেছে জাপানী, বোমার ভিতর কেউটে সাপ, ব্রিটিশ বলে বাপরে-বাপ'। রামধূনও গাইতাম, 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম' তবে সত্যি কথা, এ গান প্রাণে দাগ কাটেনি — যেরকমটা হতো 'কদম কদম

বাড়ায়ে যা' গাইবার সময়।

১৫ ই অগস্ট দিনটির কথা দিয়ে শেষ করি। সেদিন ভোরে ঘুম ভেঙেছিল পাড়ার ছেলেদের প্রভাত ফেরীর গান শুনে। স্বাধীনতা উপলক্ষে অনেক গান রচিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি — 'বন্দে মাতরম চক্র-শোভিত ওড়ে নিশান' গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই গানটিই গাওয়া হচ্ছিল প্রভাত ফেরীতে। বেলা নটায় পাড়ার সব বাড়ি থেকে শঙ্খধ্বনি করা হল — Sunday Club-এ পতাকা উত্তোলন হল। আমাদের দেখা হয়নি, আমরা তখন স্কুল বাসে। আরও একটা বিশেষ ঘটনা দেখা হয়নি — কেমন ভাবে লালকেল্লা থেকে ইউনিয়ন জ্যাক মাথা হেঁট করে নেমে গেল, সেখানে সদর্পে উড্ডীন হল 'য়হ্ ঝ ন্ডা তিরঙ্গা হমারা।' তখন টিভি ছিল না, পরে সিনেমায় দেখেছি। সারাদিনব্যাপী স্কুলের অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যায় ঠাম্মা, কাকিমা ও ক্ষুদে ভাই-বোনদের নিয়ে দুখানা গাড়ি বোঝাই করে শহরের আলোকসজ্জা দেখলাম। সব বাড়ি, রাস্তা, পার্ক সব পতাকা শোভিত, আলোকমালায় উজ্জ্বল। ঠিক মনে নেই, দেশবন্ধু পার্ক বা বিডন্ স্কোয়ার — কোথায় দাঁড়িয়ে আতস-বাজীর খেলা দেখে দিনশেষে বাড়ী ফিরলাম। সারাটা দিন কেমন করে একটা আনন্দময় ঘোরের মধ্যে কাটল। সেই সুখস্মৃতি আজও মনে অম্লান।

জয় হিন্দ্!

" ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যে সমাজ , ধিক সেই জীর্ণ সমাজকে। সবচেয়ে বড় ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায়, যখন সত্যকে চিনতে পেরেও মানতে পারিনে। সে ভীরুতার ক্ষমা নেই।"

— বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিছু স্মৃতি
কিছু ভাবনা

হারিয়ে যাওয়া

শিখা পাল, এফ ই ৭/৩

কত কী যে হারিয়ে গেল জীবন থেকে !!!
বাড়ীতে ঢুকেই 'মাআআআ' বলে চিৎকার করার অভ্যেসটা হারিয়ে গেল। ফিরতে দেরী হলে মা রেগে যাচ্ছে কিংবা বাবা-মা না খেয়ে বসে আছে ভেবে উতলা হওয়াটা হারিয়ে গেল। নানা কাজে কিংবা বাইরে বেড়াতে গিয়ে ক'দিন খবরের কাগজ পড়া হয় নি, একটু সময় করে বাবার কাছে ব'সে গত কয়েকদিনের বিশেষ খবরগুলোর একটা ধারণা নেওয়ার সহজ পথটা হারিয়ে গেল।

সারাদিনে সংসারের জন্য একটুও না ভেবে মুখের সামনে খাবার এসে যাওয়ার উপায়টা হারিয়ে গেল। আসলে জীবনযাপনের ফাঁকিবাজির রাস্তা গুলোই হারিয়ে গেল।

কেউ কারুর বাড়ী গেলে, বাড়ীতে উপস্থিত সকলের অন্ততঃ একবার অতিথির সঙ্গে সৌজনা বিনিময়ের প্রথাও যেন হারিয়ে গেল।

মানুষ একা বাঁচতে পারে না বলেই আদিমযুগ থেকে সংঘবদ্ধ হয়ে বাঁচার চেষ্টা ক'রে আসছে — সেই কথাটা সংসারের মূল শিক্ষা হিসেবে ছোটদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও বড়দের মন থেকে হারিয়ে গেল।

''আপ্ রুচি খানা, পর্ রুচি প্যাহেন্না''- এই কথাটাও হারিয়ে গেল। যা ইচ্ছে করছে তাই করার, তাই পরার, তাই বলার নামই যে স্বাধীনতা নয়, সেই কথাটা বুঝিয়ে বলার মানুষগুলোও সমাজ থেকে হারিয়ে গেল।

খাবার টেবিলে ভাল-মন্দ সব রকমের খাবারই উপস্থিত সবার সঙ্গে ভাগ করে খেতে হবে খাবার নষ্ট করা যাবে না — এসব কথা বলার মানুষেরা হারিয়ে গেল।

''পারিব না, একথাটি বলিও না আর কেন পারিবে না তাহা ভাব শতবার...'' ছোটদের জীবনে চলার পথের প্রথম শিক্ষাটুকু এমন মধুর ক'রে বলার মানুষগুলো হারিয়ে গেল।

''একটা মিথ্যে কথা শত মিথ্যার জন্ম দেয়''- জীবনের শুরুতে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার মানুষেরা হারিয়ে গেল।

''সুখের ভাগ দিতে না জানলে দুঃখের ভাগীদার হ'বার লোকও পাওয়া যাবে না''- এই কথাগুলো মনে করিয়ে দেওয়াও হারিয়ে গেল। 'আমি' নয়, 'আমরা' হয়ে কাজ করতে পারাটাই আসলে জীবনযাপনের মূল উদ্দেশ্য একথা বলতে পারার বোধটাই হারিয়ে গেল।

''তুমি তোমার বড়দের সঙ্গে, তোমার পরিবেশ-প্রকৃতি, পরিজন-সমাজের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করবে, পরবর্তী সময়ে তেমন ব্যবহারই ফিরে পাবে''— একথা মনে করিয়ে দেবার মানুষেরা হারিয়ে গেল।

শুধুমাত্র পরীক্ষা পাশের পড়াই যে জীবনযাপনের মূল শিক্ষা দেয় না, সেকথা বোঝার মনগুলোই যে হারিয়ে গেল।

পাওয়া

রাস্তায় বেরিয়ে অচেনা মানুষের কাছে আন্তরিক ব্যবহার পাওয়া- জীবনের পরম পাওয়া।

বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে ফুটপাথ দিয়ে আনমনে হাঁটছিলাম। হঠাৎ একজন মহিলা আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কিছু

বললেন। একটু এগিয়ে এসে পিছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম, SWIGGY লেখা-গেঞ্জি পরা একটি রোগা অল্পবয়সী ছেলেকেও উনি কিছু বলছেন। আমি ওনাকে ডেকে বললাম- ''আপনি আমাকে কিছু বললেন?'' উত্তরে অল্প হেসে আবেদনের ভঙ্গীতে বললেন- ''একটা এগরোল কিনে দেবে মা?'' ফুটপাথের পাশেই রোলের পরোটা ভাজা চলছে। ভাজছিল যে, সেই ছেলেটিকে বললাম, একটা এগরোল বানিয়ে দিতে। সে আমাকে দামটা পাশের লোকটিকে দিয়ে আসতে বলল। তখন দেখি, SWIGGY তকমা আঁটা ছেলেটিও একটি এগরোলের জন্য পয়সা দিচ্ছে। কি মনে হওয়াতে যেন, ছেলেটিকে বললাম- ''তুমি কি ওনার জন্য পয়সা দিচ্ছ ? তাহলে আর আমি দেব না।'' ছেলেটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। কিন্তু আমার পাশ থেকে ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন- ''না, না, তুমিই দাও পয়সাটা, ও গরীব মানুষ। ওর থেকে তুমি দিলে আমার ভালো লাগবে।''

ঠিক তখনই আমার একটা বড় 'পাওয়া' হ'ল। কী অসাধারণ জীবনবোধ !! হয়তো আমারই বয়সী, ভিক্ষা করে দিন কাটানো ওই মানুষটি উপলব্ধি করলেন এবং জোর-গলায় বলে আমায় বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমার থেকে ওই ছেলেটি বেশী কষ্ট করে দিন গুজরান করে, তাই ওর থেকে নয়, আজ আমার এই শখের খাবারটি তোমার কাছ থেকে পেলে আমার বেশী ভালো লাগবে। এগরোল বানানো পর্ব চলতে চলতে ওনার সঙ্গে বাক্যালাপে জানলাম, বাড়ীতে আর কেউ নেই- রান্নার গ্যাসও নেই- তাই পুজোর দিনে একটু জিভের নোলাকে প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছে হলো..... এই খাবারে তার রাত কেটে যাবে.....

চলে আসতে আসতে মনে হ'ল-- আমরা ক'জন পারি, অন্যের অবস্থা উপলব্ধি করে জীবনের চলার পথে নিজের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে ? এই ছোট্ট ছোট্ট শিক্ষাগুলোই জীবনের বড় পাওয়া !!! এমনি সময়েই বাবা-মাকে আরও বেশী ক'রে সঙ্গে পাওয়া যায়।

"বিদ্যা শিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? নানাবিধ জ্ঞানার্জন? তাও নয়। যে শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।''

— স্বামী বিবেকানন্দ

কিছু স্মৃতি
কিছু ভাবনা

গত শতকের পঞ্চাশের দশক - আমার ছেলেবেলা

শিউলি জানা, এফ ই ৩৭৬

শিয়ালদা-রাণাঘাট লাইনে ব্যারাকপুরের পরে পলতা। পলতা একটা ছোট স্টেশন। কিন্তু পলতা নামটা মনে হয় অনেকেরই জানা। পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস থেকে টালা ট্যাঙ্ক হয়ে কোলকাতায় পানীয় জল আসে। এই পলতা স্টেশনের লাগোয়া মহালক্ষ্মী কটন্‌মিলে আমার বাবা কাজ করতেন এবং এখানেই আমার প্রথম ছেলেবেলা কাটে। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে এই মিলে তুলো থেকে সুতো এবং সুতো থেকে মোটা শাড়ী, ধুতি তৈরী হত। সেই সময়ে এই বস্ত্রশিল্প পশ্চিমবাংলার একটি বৃহৎ শিল্প ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের প্রথম কটন্‌মিল ১৮১৮ সালে কোলকাতার কাছে ফোর্ট গ্লসটার এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য এই মিলটি বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়নি। সেই সময়ে গঙ্গার দুপাড় জুড়ে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কটন্‌মিল ছিল- যেমন, মহালক্ষ্মী কটন্‌মিল, অন্নপূর্ণা কটন্‌মিল, বাসন্তী কটন্‌মিল, রামপুরিয়া কটন্‌মিল, শ্রী দুর্গা কটন্‌মিল, মোহিনী মিল ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের বৃহদায়তন শিল্পের অগ্রগতি এবং কর্মসংস্থান এই দুটি ক্ষেত্রেই এই মিলগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাবার চাকরির সুবাদে এগুলির মধ্যে কয়েকটিতে আমার থাকার অভিজ্ঞতা আছে। সারা দিনরাত কাজ চলত শিফট্‌ ডিউটির মাধমে। শিফট্‌বদলের সময় বোঝা যেত কত লোকের রুজি-রোজগারের জায়গা ছিল এই মিলগুলি। তবে এরা সে সবাই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন তা নয়। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে অনেক মানুষ এই কাজের জন্য পশ্চিমবাংলায় আসতেন।

গুগল্‌এ সন্ধান করলে দেখা যাবে উল্লিখিত মিলগুলি প্রায় সবই এখন অতীত। ২০০৭- ০৮ এ কোন্নগরের শ্রী দুর্গা কটন্‌ মিলের জায়গায় কয়েকটি বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি দেখে একটা প্রবল ধাক্কা খেয়েছিলাম। ১৯৭০ এ অবিরাম চলতে থাকা মেশিন গুলির শব্দ কখন, কিভাবে থেমে গেল সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম। উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমার যেটা প্রথমেই মনে হল তা হল এই মিলগুলির আধুনিকীকরণের প্রয়োজন ছিল। মহালক্ষ্মী কটন্‌মিলে যে ধরনের মোটা কাপড় তৈরী হতে দেখেছি। সদ্য স্বাধীন দরিদ্র দেশে তার চাহিদা থাকলেও পরবর্তীকালে চাহিদার ধরণ পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদিত দ্রব্য যুগোপযোগী করার, চাহিদা-অভিমুখী করার প্রয়োজন ছিল। তবে বিষয়টি গবেষণা-সাপেক্ষ।

পলতা স্টেশনের গা ঘেঁষে ছিল আমাদের কোয়ার্টার। স্টেশনের এত কাছে থাকতাম বলে আমরা ছোটরা প্রায়ই স্টেশনে যেতাম ট্রেন দেখতে। আমাদের যাতায়াত ছিল অবাধ, বড়দের এই নিয়ে কোন মানসিক চাপ ছিল না। ভাবতে কষ্ট হয় আজকের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে তাদের স্কুলই নিরাপদ নয়, অভিভাবকের সঙ্গে ছাড়া স্টেশনে যাওয়া, সেই আমাদের মতো, তাদের কাছে দূরের কল্পনা।

স্টেশনে গিয়ে একটা বিশেষ ট্রেন দেখা আমাদের লক্ষ্য ছিল — সবুজ রঙের একটা মেল ট্রেন, ঝড়ের গতিতে এসে চলে যেত। কোথায় যেত তখন জানতাম না, শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম তার চলে দেওয়ার দিকে। সবুজ রঙের ট্রেন ওই একটিই ছিল। তাই আমাদের কাছে সেটি ছিল একটি বিশেষ ট্রেন। পরে জেনেছি ট্রেনটি ছিল ইস্টবেঙ্গল এক্সপ্রেস, শিয়ালদা থেকে ছেড়ে যেত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গোয়ালন্দ ঘাট স্টেশন পর্যন্ত। ট্রেনটি মোটামুটি ভাবে ঠিকঠাক চলেছিল ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় তার চলা

পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

যে সময় আমরা পলতায় ছিলাম, সে সময় দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা দিবস ঘিরে আমাদের বড়দের মধ্যে তখন ছিল প্রবল আবেগ ও উন্মাদনা। সেই আবেগ আমাদের ছোটদের মধ্যেও বেশ ভালোভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা বড়দের কাছে স্বাধীনতার সময়কার গল্প খুব মন দিয়ে শুনতাম। বাবা বলতেন বাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে খুব আস্তে রেডিও চালিয়ে শুনতেন 'রেডিও বার্লিন, আমি সুভাষ বলছি।' একথা মনে পড়লে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। আমাদের পরিবারের মধ্যে অনেকের এই সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। তাঁদের কাছে গল্প শোনার আগ্রহ ছিল আরও প্রবল। তখন প্রত্যেক বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হত। জাতীয় সংগীত গাওয়া হত সমান উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে, পালিত হত নেতাজির জন্মদিনও। আমরা ছোটরা বিশেষভাবে অংশ নিতাম প্রভাত ফেরিতে।

১৯৫৪ সাল। কল্যাণীতে কংগ্রেসের অধিবেশন। কল্যাণী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকান বায়ু সেনার ঘাঁটি ছিল। তখন সেই জায়গাটির নাম ছিল রুজভেল্ট নগর। আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের নামানুসারে এই নামকরণ হয়েছিল। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ''কল্যাণী'' নামে একটি পরিকল্পিত নগর গড়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালে কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান হিসেবে কল্যাণীকে নির্বাচন করা হয়েছিল বলে ১৯৫১ সালে প্রথম উদ্যোগ নিলেও খুব তাড়াতাড়ি এই নগর সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠে। কল্যাণী কোলকাতা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পলতা থেকে কল্যাণীর দূরত্ব মোটামুটি ভাবে এর অর্ধেক। পলতা থেকে কল্যাণী ট্রেনে গিয়েছিলাম। অবর্ণনীয় ভিড় ছিল ট্রেনে। সেই ভিড়ের কথা আজও ভুলিনি। স্বাধীন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে দেখা এবং অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে তাঁর ভাষণ শোনার অদম্য আগ্রহ নিয়ে কাতারে কাতারে লোক তখন কল্যাণীর পথে। কোনক্রমে যখন অধিবেশনের মাঠে পৌঁছলাম শুধু মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখিনি। কোথায় প্রধানমন্ত্রী, কোথায় তার বক্তৃতা। কিছু শোনারও উপায় নেই। প্রধানমন্ত্রীকে দেখা হল না এই দুঃখ বড়দের সাথে আমাদের মনের মধ্যেও থেকে গেল।

বহুবছর পর কোনও এক পৌষমেলার সময়ে আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেহেরুজিকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম। উনি বোধহয় যাচ্ছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতন। আশ্চর্যের বিষয়, আমরা বেশি নয় খুব কম জন, প্রায় বাড়িরই সবাই, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছি দেখে গাড়ি থেমে গিয়েছিল। এখন যেটা ভাবাই যাবে না।

চলে এলো শান্তিনিকেতনের কথা — আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো লাগার দিনগুলির কথা। দেশভাগের পর পূর্ববাংলার ময়মনসিংহ থেকে এসে এখানেই বাড়ি করেছিলেন আমার ঠাকুর্দা। আমার এক কাকা শ্রীনিকেতন ডেয়ারীতে কর্মরত ছিলেন, সেই সুবাদে শান্তিনিকেতনে জমি কেনা। অনেক জায়গা নিয়ে বাড়ি — বাড়ির চারদিক কোন ইঁট-সিমেন্টের প্রাচীর ছিল না। সামনেটা শুধু একটু ঘেরা ছিল তাও গাছ দিয়ে। ছিল থোকা থোকা টগর ফুলের গাছ আর মাঝ খানে দুটো লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছ দিয়ে গেট। জায়গাটার নাম পশ্চিমপল্লী। বিনয় ভবনের ঠিক উল্টোদিকে। বাড়ির সামনে এবং দুপাশে ছিল অনেকটা খোলা জায়গা। রিক্সা থেকে রাস্তায় নেমে পড়তে হত। তারপর বিরাট মাঠ পেরিয়ে বাড়ি ঢুকতাম। সেইসময় মাত্র চার-পাঁচটা বাড়ি ছিল সেখানে।। বাড়ির বারান্দায় বসলে দৃষ্টি চলে যেতো বহুদূর — এক অদ্ভুত ভালো লাগায় মন ভরে যেত। বলাই বাহুল্য এখন এই পশ্চিমপল্লীতে অনেক বাড়িঘর গজিয়ে উঠেছে, দৃষ্টি ঠেকে যায়। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল বাড়ির সামনের সেই খোলা মাঠও আর নেই, উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে জায়গাটা। এই মাঠ হারানোর কষ্টটা কত গভীর আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না। ভাগ্য ভালো, আমার ছেলেবেলায় এই প্রাচীর তৈরি হয়নি। রাস্তা থেকে দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে চোরকাঁটা তুচ্ছ করে দৌড়ে দৌড়ে বাড়ি ঢুকতে পেরেছি। সে যে কী আনন্দ বলার নয়।

বছরে তিন থেকে চারবার শান্তিনিকেতনে যেতাম।। পৌষমেলায় বহুবার গিয়েছি, বসন্তোৎসবে গিয়েছি বলে মনে পড়ে না, খুব সম্ভবত ছুটির সমস্যা ছিল। আমরা তো আর এক-দুদিনের জন্য সেখানে যেতাম না। খোয়াই, কোপাই, সাঁওতাল পল্লী, পূর্বপল্লীর মাঠ, পৌষ মেলা সব সুন্দর ছবির মত একের পর এক চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়। বাড়ির পেছনের দিক দিয়ে হেঁটে কোপাই যেতাম, যেতাম মাঠের মধ্যে দিয়ে, ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে। পৌষমেলায় আকর্ষণ ছিল কাঠের নাগরদোলা, পুঁতির মালা, ভক্তদার চানাচুর, গাছের তলায় বাউল গান, পূর্বপল্লীর মাঠে বাজির প্রদর্শনী আরও কত কি। পৌষ মেলার সেই পুঁতির মালা আর কোথাও কখনও দেখিনি। মেলায় বাড়ি থেকে হেঁটেই যাওয়া যেত, তাই যখন তখন যেতাম। বড়দের সঙ্গে যেতাম আম্রকুঞ্জের বৈতালিকে আর সমাবর্তন উৎসবে। খোয়াই তখন যেমন দেখেছি এখনও প্রায় তেমনই আছে। খোয়াই ছিল আমাদের বেড়াতে যাওয়ার জায়গা। আমাদের বাড়িতে 'পাকু' বলে যে মেয়েটি কাজ করতে আসত তার হাত ধরে আমরা সাঁওতাল পল্লীর ভেতরেও মাঝে মাঝে ঘুরতে যেতাম — কি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ছিল সাঁওতালদের বাড়িগুলি ও তাদের চারপাশ।

আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা ছিল শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে যাওয়ার রাস্তা। সেই রাস্তায় গাড়ি প্রায় চলতই না, বিশ্বভারতীর বাস ছাড়া। রাস্তা ছিল লাল মাটির যা শান্তিনিকেতনকে দিত এক বাড়তি সৌন্দর্য। আমার যেসব ভাই-বোনেরা পাঠভবনে পড়াশোনা করত অনেক সময় বিশ্বভারতীর বাস না এলে তারা খালি পায়ে ওই লাল মাটির রাস্তা দিয়ে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গান গাইতে গাইতে স্কুলের দিকে চলে যেত। তাদের এই চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার ভারী ভালো লাগত। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বছরে লালমাটির রাস্তা পিচের হল, গাড়ির চলাচল বাড়ল, খালি পায়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটাও বন্ধ হল। শান্তিনিকেতনে ছিল আমার দ্বিতীয় বাড়ি। এই বাড়ি এবং শান্তিনিকেতনের পরিবেশ মিলে আমার ছেলেবেলাটা ছিল আনন্দে ঘেরা। সেই শান্তিনিকেতন আর নেই, নেই তার খোলামেলা পরিবেশ। সেই পৌষমেলাও আর নেই, তাই যাওয়া হয় না বলে এখন আর কোনও আক্ষেপ নেই। ছোটবেলার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে, যতদিন বাঁচব তা থাকবে।

পঞ্চাশের দশকে আমার ছেলেবেলাটা সবটা আনন্দে মোড়া ছিল তা কিন্তু নয়। পলতা থেকে ট্রেনে চেপে শিয়ালদা স্টেশনে নামার পর স্টেশনের চারিদিকে যে দৃশ্য দেখতাম তা কচি মনকে খুব কষ্ট দিত। গোটা শিয়ালদা স্টেশন জুড়ে গৃহহীন, ছন্নছাড়া মানুষ। চলতে গেলে তাদের গায়ে পা লেগে যায় এমনই অবস্থা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকেই উদ্বাস্তুরা এদেশে আসতে শুরু করেন, কিন্তু প্রথম দিকে যারা আসেন তাদের হাতে কিছু পুঁজি ছিল, তারা তথাকথিত ভদ্রলোক ছিলেন। কিন্তু ১৯৫০ সালের ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর যারা আসেন তারা নিতান্তই অসহায় ছিলেন। এইসব শরণার্থীরা শিয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্মগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দিন, মাস, বছর ঘুরে গেছে তবু অনেকেই থেকে গেছেন সেই স্টেশনের মধ্যে, প্লাটফর্মের উপর। তাদের কষ্টকর দিন যাপনের কিছু খন্ড চিত্র এখনও আমার স্মৃতিপটে ধরা আছে। ঐ বয়সে দেশভাগ, শরণার্থী-সমস্যা এসব কিছু বোঝার কথা ছিল না, বুঝিও নি, শুধু মনে মনে কষ্ট পেয়েছি। শিয়ালদা স্টেশনের এই চিত্রটা ৬০এর দশকের প্রথমেও ছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে তা মুছে গেছে।

পঞ্চাশের দশকের শেষে চলে এলাম কোলকাতায়। কোলকাতায় এসে থমকে গেল আমার মাঠে মাঠে দৌড়ে বেড়ানোর, হা-ডু-ডু এবং এক্কা দোক্কা খেলার, শরতের ভোরবেলায় শিউলি ফুল কুড়োনোর, পুকুরে নেমে শাপলা তোলার, ফুটো পয়সা দিয়ে বাঁশের আগায় জড়িয়ে রাখা লজেন্স খাওয়ার ছেলেবেলা। শুরু হল শহরের জীবন। সে এক অন্য গল্প।

কিছু স্মৃতি
কিছু ভাবনা

শিকড়ের খোঁজে

ইন্দ্রনীল আইচ, এফ ই ৩৪৬

মুখবন্ধ

(গত বছর ৩রা জানুয়ারি প্রবল লড়াইয়ের মাঝে সবার এবং আমার প্রিয়, আমার বাবা, সুনীল কুমার আইচকে হারাই। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বহুল ঘটনা সম্বলিত তাঁর জীবনের বিভিন্ন অনুভব, অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার এক বর্ণময় জীবনালেখ্য ''সুনীল কথা'' নামে একটি বই লেখার কাজ শুরু করি। আগামী বছর জানুয়ারি মাসে তাঁর প্রয়াণ বার্ষিকীতে সেটিকে তুলে ধরার ইচ্ছে রয়েছে। আপাততঃ তাঁর সেই বইটির প্রথম কিস্তি এফ ই ব্লকের আবাসিক ও আপামর পাঠকদের উপভোগ করার জন্য তুলে ধরলাম। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অসম্ভব টানাপোড়েনের এই যুগে ষাটের দশকের এপার বাংলা ও ওপার বাংলার উপর বাবার জীবনের এক অভূতপূর্ব সম্প্রীতির স্মৃতিআলেখ্য। এই বইটির কাজ শুরু হয় ২০২০ সালের করোনাকালের আবহে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। পাঠককূলের অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া এই অপেশাদার লেখককে জানাতে ভুলবেন না। জানানোর ই-মেল indranilaich@aichgroup.in)

এক

স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি পাবার বছরখানেক পর বাবা সিদ্ধান্ত নেন যে, বাংলাদেশের ঢাকার হাঁসারা জেলার বিক্রমপুর গ্রামের নিজের মামার বাড়িতে একবার যাবেন। সেই হিসাবে প্রস্তুতি শুরু হয় এবং ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি যাত্রা করেন সতেরো দিনের ছুটি নিয়ে। মামারা তাদের সুদর্শন ভাগ্নাকে পেয়ে আপ্লুত হয়ে ওঠেন। পদ্মার ইলিশ, শুঁটকি মাছের পাতুরি, চিকেন স্টিমার কারি, চাঁদপুরের ভাপা ইলিশ — কোনকিছুই বাদ যায়নি। তবে, এই পর্বের মূল জায়গাটি হচ্ছে তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্ব এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক জীবন্ত ছবি, যা তাঁর স্মৃতির মণিকোঠায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যা জাজ্বল্যমান ছিল। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নিজেদের গ্রাম, ভিটেমাটি দেখার পর ফেরার ট্রেনটি ছিল শুক্রবার দুপুর একটায়।

এই যাত্রার পটভূমি এবং তদানীন্তন প্রেক্ষাপটটা একটু তুলে ধরা দরকার। বাবা যাত্রা শুরু করেন ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে, তখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি এবং ইস্ট পাকিস্তান নামে পরিচিত জম্মু ও কাশ্মীরের হজরত বাল দরগায় রাখা হজরত মহম্মদের চুল চুরি যাবার ঘটনাটি ঘটে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং তার প্রভাব বাংলাদেশে শুরু হয়। এই অধ্যায়টি লিখতে গিয়ে গবেষণা করে দেখলাম নেহেরু শ্রীনগরে তার সবচেয়ে কাছের দুইজন জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টাদের পাঠান। থমথমে সেই শ্রীনগরে ঢুকতে প্রায় সাত দিন লেগে যায়। সব বাধা অতিক্রম করে শ্রীনগরের বুকে অবশেষে সেই তদন্তের কাজ শুরু হয়।

বাবার বাংলাদেশ সফর যখন শেষের দিকে তখন সেই সাম্প্রদায়িক অশান্তির উষ্ণতা ধীরে ধীরে ইস্ট পাকিস্তানে থাবা বসাতে থাকে। পদ্মা নদীর এপার-ওপার দুদিকেই তখন সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয়ে যায়। আমার ঠাকুমার দাদারা বা বাবার মামারা প্রমাদ গোনেন, নিজেদের প্রিয় ভাগ্নেকে ভারত তথা সোদপুরে পৌঁছে দেওয়াই তখন প্রধান লক্ষ্য। ইসলামিক রীতিনীতি, ইসলামিক শ্লোক, বোরখা সব রকমের প্রতিষেধক দিয়ে পদ্মা নদী অবধি বাবাকে পৌঁছে দিলেন। স্টীমারে উঠেই রেডিওতে হানাহানির খবর। ডিসেম্বরের হিমেল হাওয়া, তার মাঝে ঘন কুয়াশায় স্টীমার পৌঁছাতে প্রায় দেড় ঘন্টা দেরী হ'ল।

স্টীমার থেকে দৌড়ে নেমেই কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের সময় তার প্রিয় দইয়ের হাঁড়িটি ঘেঁটে পরীক্ষা করা হয়। তাতে সোনা দানা কিছু আছে কিনা দেখতে।

কোন এক পদ্ধতিগত কারণে তার ফেরার কাগজ গুলি আটকে যায়। স্টেশন মাস্টার, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স এবং সেই হেতু তার প্রিয় দইয়ের হাঁড়িটির উপর অত্যাচার। ভোজন রসিক নব যুবকের কপালে আরও চিন্তার রেখা পরে যখন তিনি ক্লিয়ারেন্সটি পান কারণ ততক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের দিকে ট্রেনটি রওনা হয়ে গিয়েছে। বিষন্নতা ও সাম্প্রদায়িক অশান্তির চিন্তা মাথায় নিয়ে তিনি তখন দিশাহারা। জানতে পারেন যে পরবর্তী ট্রেনটি আছে সোমবার। মাঝ খানে কোথায় থাকবেন, কি খাবেন, কি করবেন তার কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সেই দুর্বিপাকে একটু আলো দেখা গেল; কাস্টমস অফিসের মেজবাবুর সঙ্গে স্টেশনমাস্টারের ঘনিষ্টতার ফলস্বরূপ বাবার স্থান হল স্টেশনমাস্টারের লাগোয়া রুমটিতে।

সেই যুগে না ছিল আইএসডি না ছিল মোবাইল। ঠাকুমার মুখে শুনেছি, কোন খবর না পাওয়ায় সবার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্টেশনে প্রায় আধঘন্টা বসে থাকার পর হঠাৎই দেবদূতের মত আবির্ভাব হয় স্টেশনমাস্টারের এক পারিবারিক বন্ধু সীমান্তবর্তী স্কুলের এক প্রধান শিক্ষকের। ছোট্টখাট্টো চেহারা। অনেক আলাপ-চারিতার পর ইংরেজিতে যাকে বলে ''Bolt from the blue,'' সেই প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রস্তাব দেন, 'আপনি চলেন আমার বাড়ি দুইদিন থাকবেন, তারপর সোমবার ট্রেন ধরাইয়া দিমু' সেই ভদ্রলোকের পড়াশোনা কলকাতায় এবং তাঁর স্ত্রীও কলকাতায় শিক্ষিতা। তাঁর দুই মেয়ে —একজন বিবাহিতা, অন্যজন অবিবাহিতা। পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, এই নামটি মনে না রাখার জন্য, যদিও আমার বাবা নামটি বলে গেছিলেন, কিন্তু আমার তা লিখে রাখা হয়নি। তার এই স্বজ্জন মুসলমান ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিটি সম্প্রীতির একটি সুবর্ণ রেখা কেটে গিয়েছিলেন আমার বাবার মনে, যা আমার মাধ্যমে আজও বিরাজমান। তবে এই স্মৃতিআলেখ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ধরে নিন ওনার নাম 'মইনুদ্দিন'।

মনে একরাশ ভয় ও আশঙ্কা, মামাদের শেখানো বিভিন্ন ইসলামিক প্রার্থনা — সব মিলিয়েই যখন সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, তখন মইনুদ্দিন সাহেবের বাড়ির গেস্টরুমে গরম চা, মুড়ি এবং বিকেলের জলখাবার এসে উপস্থিত। ওনার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার গল্প, সেখানে স্ত্রীর সাথে আলাপ, বাংলাদেশে ফিরে এসে চাকরি, বিবাহ এবং দুই মেয়ের জন্মের গল্প করতে করতে রাত তখন দশটায় এবং রাতের খাবারের জন্য ডাক। বাবার মনে তখন অন্য আশঙ্কা এ সাংঘাতিক সম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাঝে এই মানুষটি বিশ্বাসযোগ্য তো? খাবারের মধ্যে কিছু মেশানো নেই তো? কেন এত আতিথেয়তা? সংবাদমাধ্যমে তখন ভেসে আসছে হানাহানির নানা গল্প। একুশ বছরের তরতাজা যুবককে তুলে দেবেন না তো মৌলবাদীদের হাতে? শত পিড়াপিড়িতেও কোন কাজ হল না। বাবা কিছু না খেয়েই রাত কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। শিক্ষক স্বামী-স্ত্রী ব্যর্থ হয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে গেলেন আর এই তরতাজা যুবকটি সারারাত না ঘুমিয়ে জেগে রইলেন। সারারাত নানা বিপদের চিন্তা ঘিরে ধরল। দু চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। সকাল হতেই ঘটিদের জলখাবার উপস্থিত। লুচি আলু-চচ্চড়ি। বাবা কিছুটা যেন ভরসা পেলেন।

আর থাকতে পারলেন না। মইনুদ্দিন সাহেবের অযাচিত তদ্বিরে বাবার কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা দিল । কোন রকমে প্রাতঃরাশ সেরে ফিরে যাবার তোড়জোড় আরম্ভ করলেন। এদিকে ইতিমধ্যেই মইনুদ্দিন সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর মনে একটি নতুন আশঙ্কা দানা বেঁধেছে। হয়ত ওনারা মুসলমান বলে ওদের বাড়িতে বাবা খেতে চাইছেন না।

দুই

হঠাৎ করেই বলে বসলেন,'আজকের দুপুরের খাওয়া ওনারই স্কুলের এক শিক্ষক প্রামানিক বাবুর বাড়ীতে।' কোথাও যেন একটু ভরসা পেলেন বাবা আবার অবাকও হলেন এই প্রধান শিক্ষকের চিন্তাধারা দেখে। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে জানালেন যে সেরকম কিছু নয়। এই সাম্প্রদায়িক অশান্তির মাঝে আকস্মিক আটকে যাওয়ায়

তিনি যে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত, তা বোঝানোর চেষ্টা করলেন। প্রধান শিক্ষকের আতিথেয়তা এবং তার আপ্যায়ন যে কতটা আন্তরিক তাও বললেন । প্রামানিক বাবুর বাড়িতে আমার ভোজনরসিক বাবার খাওয়ার স্মৃতিগুলি অমলিন ছিল। তিনি এই পর্বটি যখন আমায় বলেছিলেন তখন করোনার প্রথম ঢেউ চলছে। স্পষ্ট মনে আছে তিনি আঠারো পদের উল্লেখ করেছিলেন। তার মধ্যে পাবদা, ইলিশের রকমফের। আরো চমক, সন্ধ্যাবেলায় স্থানীয় মুসলিম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে চা পানের আমন্ত্রণ এবং ব্যাডমিন্টন খেলা। কোথাও যেন মানসিক উদারতার এক সুর্যোদয় দেখেছিলেন বাবা। সেই সন্ধ্যা চা পানের আসর গড়িয়ে গড়িয়ে রাত হয়ে গেল। ওপার বাংলা থেকে ভেসে আসা মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও সংগ্রামের গল্প সারা সন্ধ্যে জুড়ে অব্যহত থাকল। পিসি ও বাবাকে নিয়ে ১৯৩৯ সালে ঠাকুমা ও দাদু চলে আসেন সোদপুরে। নিজেদের ছেঁচাবেড়ার ঘর, তারপর আরও চার সন্তানের জন্ম। বঙ্গশ্রী কটন মিলে স্ট্রাইকের পর মাথা না মুড়িয়ে ফিরে যাওয়া, আমার প্রয়াত ঠাকুরদা শচীন্দ্র চন্দ্র আইচের সামান্য ব্যবসায়ীক প্রচেষ্টাকে দাঁড় করানো, প্রথম সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য এবং তার ফলস্বরূপ বাবার জীবনসংগ্রামের গল্প সারা সন্ধ্যে জুড়ে রইল। পরের দিন রোববার আশঙ্কার মেঘ অনেকটাই কেটে গেছে দুপুরে, রাতে জমিয়ে খাওয়া এবং বহু আড্ডা ও গল্প। ইতিমধ্যেই মইনুদ্দিন সাহেব আরেকটি অঘটন ঘটিয়ে বসলেন। যে দইটি বাবা এনেছিলেন, বাংলাদেশ কাস্টমসের দৌলতে তা প্রায় গ্রহণ অযোগ্য হয়ে যায়। মাস্টারমশাই তার একজন প্রাক্তন ছাত্রকে ডেকে পাঠান এবং রবিবার সে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়, সেই দইটি কিনে আনার জন্য। সোমবার সকালে সে হাজির টাটকা দই নিয়ে এবং স্কুল কামাই করে শিক্ষক দম্পতি ছাড়তে এলেন বাবাকে।

কাস্টমস অফিসারকে চড়া সুরে প্রধান শিক্ষকের আদেশ, ‘এই দইটি আমি কিনা দিসি। এর মধ্যে হাত দিয়েন না’। অশ্রু সজল নয়নে এবং কৃতজ্ঞতায় বাবা সেই স্টেশনটি ছাড়লেন। ট্রেন এসে থামল ভারত সীমান্তে। ছেঁকে ধরল বাংলা, হিন্দী এবং ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিকরা। হানাহানির খবর পেতে ব্যস্ত, কজন হিন্দু, কজন মুসলমান মরলেন, সাম্প্রদায়িক অশান্তি কতদূর ছড়ালো ইত্যাদি কেউ যেন শুনতে চাইলো না সম্প্রীতি ও শিক্ষিত মানুষের উদারতার এই সত্য ঘটনাটি। কপালের ফেরে তাঁর নামটি বাবা বলা সত্ত্বেও আমি লিখে রাখতে পারিনি। বাবা যখন শেষ শয্যায় কষ্ট পাচ্ছেন, ভেন্টিলেশনে যাওয়ার আগে নামটি জানার অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। যাই হোক, আজকের এই কঠিন বাস্তবে আমার মনে হয়েছিল সম্প্রীতির এমন একটি জীবন্ত ঘটনাকে লিপিবদ্ধ না করাটা অন্যায়, তাই ঐ মহান, অজানা মহানুভব প্রধান শিক্ষকের প্রতি এই অধ্যায়টি সমর্পণ করলাম।

“টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা পান্ডিত্য। তেমন দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব ’’

— কাজী নজরুল ইসলাম

কিছু স্মৃতি
কিছু ভাবনা

বিস্ময়কর স্বপ্নের দেশ
লেহ্ লাদাখ

দীপা ঘোষ, এফ ই ৪২৪

আমার দেশ ভারতবর্ষ। শস্যশ্যামলা, ফুলে ফলে ভরা। কি নেই! প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এই দেশ। রবিঠাকুরের গানে — 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। ২০২২ সালের ২রা অক্টোবর সপরিবারে হঠাৎ আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল 'লেহ্ লাদাখ' ভ্রমণ। সে এক বিশাল অভিজ্ঞতা। যেমন সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, তেমনই শারীরিক কষ্ট।

আমরা প্রথমে ২রা অক্টোবরের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দর থেকে দিল্লি গেলাম, তারপর সেখানে থেকে কানেক্টিং ফ্লাইট ধরে লেহ্ পৌঁছলাম দুপুর তিনটে নাগাদ। ফ্লাইট থেকে লেহ্ শহরের দৃশ্য ছিল অভূতপূর্ব। ফ্লাইট থেকে নামার আগেই এনাউন্স হচ্ছে লেহ্ পাহাড়ী এলাকা, খুব ড্রাই আবহাওয়া, খুব জল খাবেন, হাল্কা খাবার খাবেন, ধীরে ধীরে চলবেন, শ্বাসকষ্ট হয় অনেকের। এমনভাবে বলছে শুনলেই ভয় লাগার একটা ব্যাপার তৈরী হয়ে যাচ্ছে। যথারীতি ড্রাইভার এসেছিল আমাদের নিতে, হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে আমার কর্তামশাইয়ের নাম লেখা, হোটেলও বুক করা ছিল আগে থেকেই।

ভারতের লাদাখ রাজ্যের ও পূর্বতন জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের লেহ্ জেলার সদর দপ্তর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৫২৪ মিটার উঁচুতে অবস্থিত এই শহর, হিমালয় পর্বত দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত। লেহ্ শহরের আবহাওয়া শীতল মরুভূমির মতো, অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত শীতকালের বেশীরভাগ সময় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে অবস্থান করে ও মাঝে মাঝে তুষারপাত হয়। বছরের বাকি সময়ের আবহাওয়া গরম থাকে। আমরা লেহ্তে পৌঁছে ২৪ ঘন্টা বিশ্রাম নিয়েছিলাম, কারণ একটাই অক্সিজেন লেভেলকে ঠিক রাখা। পাহাড়ী শহর, একটাই অসুবিধা, অক্সিজেন লেভেল অনেক নীচে নেমে যায়, শ্বাসকষ্ট সেরকম কিছু হয় না, কিন্তু মাথাটা সব সময় ভার হয়ে থাকে, ব্যথা হয়। আমি লেহ্তে পৌঁছে হাল্কা খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম, ঘুম থেকে ওঠার পর মনে হল আমার মাথার ওজনটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। অক্সিমিটার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম — অক্সিজেন লেভেল ৮৬ দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর প্রেস ক্রাইব করা মেডিসিন খেয়ে নিলাম। রেস্ট নিলাম। ঘন্টা দুয়েক পরে আস্তে আস্তে ঠিক হল।

লেহ্শহরের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলি হল শান্তি স্তুপ লেহপ্রাসাদ, Rancho School (3 idiots সিনেমাতে যে স্কুলটাকে দেখিয়েছিল)। Stakna Monastry লেহ্মার্কেট অনেকটা দার্জিলিং ম্যালের মত লাগে, মাঝ খানে বসার জায়গা, চারিদিকে দোকান। আমরা ছিলাম লাদাখ ইন্ বলে একটি হোটেলে, টপ ফ্লোরে ছিলাম বলে কাঁচের জানালা দিয়ে পাহাড়ের দৃশ্য অসাধারণ!

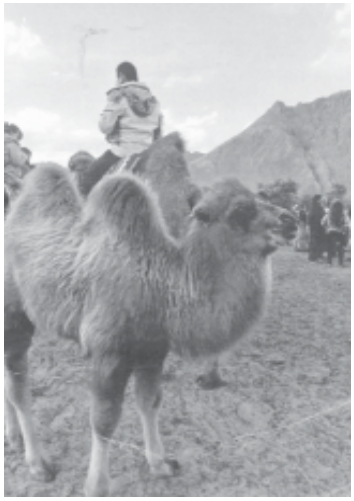

লেহ্ থেকে আমাদের ট্যুরের প্রথম গন্তব্যস্থল ছিল নুব্রা ভ্যালি লেহ্ থেকে নুব্রা ভ্যালি পৌঁছতে প্রায় বিকেল হয়ে গিয়েছিল। আমরা প্রথমে ক্যামেল রাইডে

গেলাম উটের দুটো কুঁজ, সেটা ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা যায় না। লাদাখ ঠান্ডা মরুভূমি বলে এখানেই দেখতে পাওয়া যায়। নুব্রা ভ্যালিতেই আমরা তুরতুক গ্রাম দেখেছিলাম। আপেল গাছ দেখেছিলাম। সেদিন আমরা হোটেলে চলে গেলাম। পরের দিন সকাল সকাল আমরা গেলাম খারদুংলা পাস দেখতে, যেটা পৃথিবীর বৃহত্তম motorable রোড (১৮ হাজার ৩৮০ ফিট)।

অসাধারণ দুপাশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, বরফে ঢাকা পাথরের পাহাড়। অসাধারণ। চোখে না দেখলে বলে বোঝানো যাবে না। দুচোখ ভরে দেখলাম।সূর্য্যদেব থেকে থেকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। খুব ঠান্ডা। সঙ্গে হাওয়া। খারদুংলা পৌঁছে দেখলাম, অনেকেরই খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমাদের ড্রাইভার আগেই বলে দিয়েছিল বেশী জোরে হাঁটবেন না। আমরাও ঘুরে ঘুরে আশেপাশের দৃশ্য দেখছিলাম। কি অসাধারণ প্রকৃতি, সঙ্গে ছবি তোলাও চলছিল, খুব ধীরে ধীরে। আর্মিরা পুরো দেখাশোনা করে লাদাখ লেহ্।

আমরা আর্মিদের চালানো ক্যান্টিনে গিয়ে jinger tea পেলাম। খুব ভালো লাগছিল ঠান্ডার মধ্যে। ওই ক্যান্টিনেই দেখলাম শ্যামবাজার থেকে চারজনের একটি দল গিয়েছিল। ভদ্রমহিলার খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। খুব কাশি হচ্ছিল। মাঝ বয়সী। ওরা পোর্টেবল অক্সিজেন বটল নিয়ে গিয়েছিল। সেটা দিয়ে ওনাকে সুস্থ করা গেল না। আর্মিরাও এগিয়ে এসেছিল হেল্প করার জন্য। বেসিনটা দেখলাম কলের জল বরফ হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় বরফ পড়ে আছে। কি অসাধারণ অনুভূতি। সবই প্রকৃতির খেলা। খারদুংলা থেকে ফেরার পথে আমরা এটিভি রাইড করলাম। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তিন চাকার টু সিটার মোটর বাইক, গিয়ার ছাড়া এক্সেলেটর দিয়ে চালাতে হয়। বালির এবড়োখেবড়ো, উঁচু নিচু রাস্তায় চলানো। খুব মজা সঙ্গে আবার ভয়।

পরের দিনের গন্তব্যস্থল ছিল জিরো পয়েন্ট। চীনের বর্ডার দেখা যাচ্ছে। আর্মিরা কিভাবে আমাদের দেশকে রক্ষা করছে! ওদের স্যালুট জানাই। পাথরের পাহাড়। কোন গাছ নেই। এটাই লাদাখের পাহাড়ের বৈশিষ্ট্য। পাশ দিয়ে সায়ক নদী বয়ে চলেছে, সুন্দর! সুন্দর! অপরূপ প্রকৃতি। যতই দেখছি ততই ভাবছি, প্রকৃতির কী অসাধারণ রূপ চোখ ভরে অনুভব করে মন। সেদিনই বিকেলের দিকে গিয়ে পৌঁছলাম বহু প্রতিক্ষিত প্যাংগং লেক। প্যাংগং বিশ্বের সর্বোচ্চ লবণাক্ত জলের হ্রদ। প্রায় ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এক তৃতীয়াংশ ভারতে এবং বাকি অংশ চীনে। বিশাল লেক, জলটা পুরো নীল। মনে হচ্ছে বিদেশে চলে এসেছি। লোকজন খুব কম। আকাশ নীল। কি অসাধারণ! আমরা লেকের পাশে টেন্ট হাউজে ছিলাম। রাত কাটিয়েছিলাম। এখানে সন্ধ্যা সাতটা থেকে সারারাত কারেন্ট থাকেনা। পুরোটাই দিনের আলোর উপর নির্ভরশীল। রানিং ওয়াটারও থাকে না। বাথরুমে দু বালতি জল থাকে। যেহেতু লেক এর পাশে, ঠান্ডাও মারাত্মক। আমরা পরের দিন ভোরবেলা ব্রেকফাস্ট করে রওনা দিলাম নতুন জায়গা হ্যানলে র উদ্দেশ্যে সেটাও রিমোট এরিয়া। এখানেও রাত্রি দশটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত কারেন্ট থাকে না। ছোট ছোট সব homestay। আগে থেকে বুক করা না থাকলে আবার পাওয়া যায় না। এখানেই আমাদের একদল বাইক আরোহীর সঙ্গে দেখা হলো। ওরা মানালি থেকে বাইকে আসছে। লাইন দিয়ে যখন পরপর সব বাইক যাচ্ছিল, খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে। মানুষ কত রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চায়। জীবন তো একটাই।

যাই হোক এই homestay গুলোতে ব্রেকফাস্ট — চা মাখন-পাউরুটি, জ্যাম আর রাতের খাবার ভাত রুটি অড়হার ডাল আচার আর যে কোন একটা সবজি এই হচ্ছে খাদ্য তালিকা। খুবই গরীব লোকজন, খুব সহজ সরল,

টুরিস্টদের আসা যাওয়ার ওপরেই ওদের জীবিকা নির্ভর করে।

Hanley যাওয়ার সময় আমরা RezangLa War Memorial দেখেছিলাম– in memory of Major Saitan Singh & his men. ওখানে একটা শো দেখানো হয় পনেরো মিনিটের জন্য। কিভাবে Major Saitan Singh নিজের জীবন দান করে ভারতকে বাঁচিয়েছিলেন। ১৮ই নভেম্বর ১৯৬২ তে Sino-Indian War -এ Major Saitan Singh এর নেতৃত্বে ১২৪ জন ভারতীয় চীনা সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধে কিভাবে নিজেদের জীবন দান করেছিলেন। চীনের হাজার সৈনিক সেই যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। কত কিছুই আমাদের অজানা ...

Hanleyতেই আমরা দেখেছিলাম migratory bird– Indian Astronomical observatory —যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় observatory– Hanley Monestery — পাহাড়ের চূড়ায়, কি অসাধারণ! Hanley বিখ্যাত রাতের আকাশের জন্য। রাতে—অবাক করা অনুভূতি।

আমাদের পরের গন্তব্যস্থল ছিল Hunder, গরম জলের প্রস্রবন। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। মাটির নীচ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে আর উপরে জল টগবগ করে ফুটেই চলেছে। কি সাংঘাতিক প্রকৃতি। জলে ডিম সেদ্ধ করতে চাইলে দিয়ে দিলেই হবে। পাঁচ মিনিটেই সেদ্ধ হয়ে যাবে। এমন টগবগ করে জল ফুটছে। ওখানে আমরা আধঘন্টা থেকে লাঞ্চ করলাম — ম্যাগি দিয়েই সব জায়গায় লাঞ্চ করেছিলাম। ফিরে আসলাম সন্ধ্যেবেলা লেহ্‌তে অসম্ভব ঠান্ডা থাকার জন্য এত জার্নি করে মনেই হয় না কোন রকম অসুবিধা। তবে অনেক জল খেতে হয়। পরের দিন লেহ্‌তে সারাদিন রেস্ট আর অল্প ঘোরাঘুরি করে ফেরার পালা। খুব মন খারাপ লাগছিল এত সুন্দর জায়গা থেকে বিদায় নেবার কথা ভেবে।

আমাদের ফ্লাইট ছিল লেহ্‌ টু দিল্লী, দিল্লী টু কলকাতা। লেহ্‌ থেকে সকাল দশটায় ফ্লাইট ছাড়ার কিছু পরেই ফ্লাইট এর উইন্ডো দিয়ে নীচে শহরটা কি যে সুন্দর লাগছিল কি বলব—পুরো বরফের চাদর , মনে হচ্ছিল সাদা বিছানার চাদর দিয়ে সব ঢাকা ! অসাধারণ ! অসাধারণ ! অসাধারণ প্রকৃতির রূপ।

রবীন্দ্রনাথের কথায় —

''হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল, আজি মম পূর্ণ হল
শুন সবে জগতজনে।।
কী হেরিনু শোভা, নিখিলভুবননাথ
চিত্ত-মাঝে বসি স্থির আসনে।।''

" মন্দিরের বিগ্রহ যেমন ঈশ্বরের বিগ্রহ, মানুষও তেমনি ঈশ্বরের বিগ্রহ। পার্থক্য এই যে একজন নির্বাক; আর একজন সবাক। এই সবাক বিগ্রহের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচানোই আমার জীবনের ব্রত।''

— স্বামী বিবেকানন্দ

কিছু স্মৃতি
কিছু ভাবনা

দুই বন্ধুর কাহিনী

সিপ্রা মুখার্জী, এফ ই ৩৬

আমার বাবার মৃত্যু হয়েছিল 'হার্ট ফেলিওরে,' বেশ কিছু দিন ভোগার পর। তবে বাবার প্রথমবার হার্ট অ্যাটাক হয়, যখন বাবার ছোটবেলার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু 'ছকাকাকু' বাবারই হাতে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। ছকাকাকুর শেষ কথা ছিল ডাক্তার, আমাকে বাঁচাও। 'ছকাকাকু' বাবাকে বরাবর 'ডাক্তার' বলেই ডাকত। আমি একবার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ''বাবা, তোমাকে কাকু, নাম ধরে কেন ডাকেনা? তোমরা তো ছোটবেলার বন্ধু''। বাবা বোধহয় সে প্রশ্নের কোন সুটেব্যল উত্তর খুঁজে পায়নি, না পেয়ে বলেছিল, ''কেন আমি কি ডাক্তার নই?'' এখন আমার লজ্জা লাগে কেন যে আমি বোকার মত প্রশ্ন করেছিলাম। বাবাদের ফ্রেন্ডশিপটা ছিল একটু অন্যরকমের। এতদিন পরে পেছনে ফিরে দেখলে তার সত্যিকারের চেহারা, অর্থটা বোধগম্য হয়... এটার ভিত্তি শুধু বন্ধুত্বের ছিল তা নয়, এর মধ্যে নিহিত ছিল এক গভীর শ্রদ্ধা ও অগাধ বিশ্বাস। আমার ঠাকুরদার ছিল কঠিন পারসোনালিটি, লম্বা পেশীবহুল চেহারা, আর ছিল ঘন কালো গোঁফ। বাবার মুখে শোনা, দাদুর দু হাজার বিঘার ওপর চাষের জমি ছিল। মানব দরদী, পরোপকারি, একান্ত ধর্ম নিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। মাকে প্রায়ই বলতে শুনেছি, 'উনি ছিলেন নারকেলের মতন,বাইরে থেকে কঠোর আর ভেতরটা ঠিক নারকেলের শাঁসের মতন নরম' ।তবে কিছু কিছু ব্যাপারে বেশ রক্ষনশীল ছিলেন। কিছুতেই বাবার এই বন্ধুত্ব নিচু জাতের সাহা ফ্যামিলির ছেলের সঙ্গে, মেনে নিতে পারতেন না। ওরা দুজনে কিন্তু এক ক্লাসেও পড়ত না। ছকাকাকুর কাছে স্কুল যাওয়া টা তো খেলা ছাড়া আর কিছু ছিলনা, তাও খুব বেশি দিনের নয়। এদিকে বাবার পড়াশুনার ওপর দাদুর কিন্তু বেশ কড়া নজর ছিল। বাবা তো মজা করে বলত, আমার ঠাকুরদার এই 'বিবেকানন্দ' 'সুভাষ বোস' বানানোর প্রচেষ্টায়, 'আমাকে আরো যেন পড়াশুনা থেকে দূরে ঠেলে দিত'। তবে কোন দুষ্টুমি করার সময়, ডাঙগুলী খেলার সময় এই নিচু জাতের ছেলেটিই বাবার প্রধানতম সাকরেদ ছিল। 'অপরের বাগান থেকে ডাব চুরির সময় ছকাই ছিল আমার একমাত্র ভক্ত হনুমান', বাবা বলতো।

বাবার ম্যাট্রিকুলেশন এর রেজাল্ট বেরোলো। ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। সবাইকে মিষ্টি দেওয়া হল। শুনেছি, বাবা তার নিজের শেয়ারটা দিতে ছুটেছিল বাড়ির বাইরে যেখানে ছকাকাকু দাঁড়িয়ে ছিল, বন্ধুর প্রতীক্ষায়। তার তখন সাহস ছিলনা বন্ধুর বাড়িতে ঢোকার। আমার ঠাকুরদার দুর্দান্ত প্রতাপই সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু সে বাধা এই বন্ধুত্বে কোন ভাঁটা সৃষ্টি করতে পারেনি। বাবা গল্প করত, বাবার কলকাতায় ডাক্তারী পড়তে যাওয়াতে তার বন্ধুর কী আনন্দ, সবাইকে বলে বেড়াতো, 'দেখো মনি একদিন খুব বড় ডাক্তার হবে।' মনে তার হিংসার লেশমাত্র ছিলনা। তার কাছে তো এটাই ছিল স্বাভাবিক। ঐ রকম বড়লোক ব্রাহ্মণের বাড়ির ছেলের সঙ্গে কি তার মতন মোটর মেকানিকের ছেলের তুলনা চলে! যদিও তখন তাদের ব্যবসা আগের থেকে অনেক ভালো, মনে হচ্ছে শুনেছিলাম যোগেন সাহা, ছকাকাকুর বাবা লটারী তে কিছু টাকাও পেয়েছিল। কিন্তু এত-শতোর পরেও তাদের সম্পর্কের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। ইতিমধ্যে তাদের দুজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তার জন্যও কিন্তু তাদের বন্ধুত্বে কোন ফাটল ধরেনি। আমি একবার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মা তুমি কি করে এমন অসম বন্ধুত্বকে মেনে নিয়েছিলে?' মায়ের উত্তর আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। 'এত গভীর, নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব ছিল যে কিছুদিনের মধ্যে আমিও কত প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, ছকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি।

আমার ঠাকুমার একটা কথা আমাকে আজও ভীষণ ভাবে

বিচলিত করে। তখন সেই বেঙ্গল ফেমিনের সময়। চতুর্দিকে 'ফ্যান দা, ফ্যান দাও' রব। বাবা নাকি সবার অগোচরে ফ্যানের মধ্যে নিজের ভাত মিশিয়ে বন্ধুকে দিয়ে আসত। আমার ঠাকুমার কিছুটা সফট্‌নেস ছিল ছেলের বন্ধু হিসেবে, যদিও সাহস ছিল না তখনকার জাত পাতের বিধিনিষেধ ভাঙার। অথচ আমার ঠাকুরদা যখন মারা যায়, কলকাতাতে বাবা তখন ছাত্র মাত্র, বাবার এই বন্ধুই ছিল বাবার সব সময়ের সঙ্গী। আমার মনে আজ এই সময়ে দাঁড়িয়ে একটা প্রশ্ন জাগে, আমার ঠাকুরদা নিশ্চয় মনে মনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল ও বাবার ঐ বন্ধুকে অনেক আশীর্বাদ করেছিল।

সময়ের সাথে সাথে অনেক পরিবর্তন হল। বাবা ডাক্তারী পাস করল, ছকাকাকুও মোটর মেকানিক এর গ্যারাজ খুলল, অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। ধীরে ধীরে আমাদের ফ্যামিলির সাথে আরও ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগলো। ছকাকাকু একটা জিপ গাড়ি কিনলো। মা বলেছিল ঐ গাড়ীতে মা বাবাই ছিল প্রথম সওয়ারি। তবে সব থেকে আশ্চর্যের ঘটনা ঘটল বাবার বন্ধুর আমূল পরিবর্তন। নিন্দুকদের সব জল্পনা কল্পনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দিল। ছকাকাকু সমাজের এক জন গন্য মান্য হয়ে উঠল। তবে বাবাকে প্রায় ভগবানের মতন শ্রদ্ধা করত।

ইতিমধ্যে বাবা উচ্চ শিক্ষার জন্য লন্ডনে পড়তে গেল। আমরা তিন ভাই বোন তখন খুব ছোট। আমার ঐ দৃশ্যটা একটু একটু মনে আছে। বেশ রাত্রি, ছকাকাকু তার সেই জীপ গাড়ি নিয়ে হাজির তার বন্ধুকে স্টেশনে বিদায় জানাতে। আমি নিশ্চিত সেদিন বাবাকে তার সেই অশিক্ষিত বন্ধু আশ্বাস দিয়েছিল প্রয়োজনে সে আমার মায়ের পাশে থাকবে। যদিও মা সেই সময়টা তার মা বাবার কাছেই ছিল। তবে আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল পুরোপুরি, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, কবে তার ডাক্তার দেশে ফিরবে বিলায়িতি ডিগ্রী নিয়ে।

বাবা প্রায় পাঁচ বছর পর ফিরল। হাওড়া স্টেশনের অনেকটা পোরশন বাবার বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনদের ভিড় ছিল। আমরা তিন ভাই বোন আর মা আমার ছোট কাকুর সঙ্গে গিয়েছিলাম, বেশ সাজুগুজু করে, যদিও বাবা নেমেই বলেছিল 'আমার ছেলে মেয়েগুলো কে তুমি কালো করে দিয়েছো টুটু।' টুটু আমার মা এর ডাক নাম। বাবা ট্রেন থেকে নামল স্ট্রাইপ কালো সুট আর টাই, রঙটা ঠিক মনে পড়ছে না, আনন্দে খুশীতে উদ্ভাসিত। কিন্তু বাবার চোখ যেন কিছু একটা খুঁজছে। বাবার চোখ অত ভীড়ের মধ্যে এক জনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে, 'ছকা কোথায়?' সে তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার বিলেত ফেরত বন্ধুকে জলভরা চোখে অপলক দৃষ্টিতে দেখছে। তার পরের দৃশ্য তো ভোলার নয়। হাওড়া স্টেশন সাক্ষী ছিল সেই দুই বন্ধুর দীর্ঘ আলিঙ্গনের। ছকাকাকু তখন তার সব দ্বিধা কাটিয়ে ফেলেছে, তার বিলেত ফেরত বন্ধু কি এই পুরনো বন্ধুকে মনে রেখেছে?

বাবা তার প্রথম প্রাকটিস শুরু করে তার এই বন্ধুর বাড়ির নিচের ঘরেই, আমাদের নতুন বাড়ি তৈরি হওয়ার আগে। আমাদের নতুন বাড়ি তৈরির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিল এই ছকাকাকু।আর আমরা মাত্র ছ মাসের মধ্যে আমাদের নতুন বাড়িতে প্রবেশ করলাম বিরাট জাঁকজমকের মধ্যে। ইতিমধ্যে ছকাকাকুও বেশ নামকরা কন্ট্রাক্টর হয়ে উঠেছে। ছকাকাকুরও ইচ্ছা তার ছেলে মেয়েরাও যেন সুশিক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ছে। ছকাকাকুর বড় মেয়ে যখন স্কুল ফাইনাল পাশ করে তখন হৈচৈ ব্যাপার, তাদের ফ্যামিলির এটাই প্রথম ঘটনা। বাবাকে খুব দুঃখের সঙ্গে বলে ছিল 'বুঝলে ডাক্তার সাইন্সে যদি সংস্কৃত থাকত তাহলে ওকে সাইন্সই পড়াতাম, ও সংস্কৃতে খুব ভালো তো'। বাবা তার বন্ধুর এই অজ্ঞানতাকে হাসি মুখেই মেনে নিয়েছিল, বরঙ তার এই সদিচ্ছার প্রসংশাই করেছিল। শুধু বন্ধুর ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'ভুটোপেটা, তোকে আর মানুষ করতে পারলাম না।' বাবা মাঝে মাঝেই ছকাকাকুকে ঐ নামে ডাকত। সময় পেলে বাবার খাটে বসে দুজনের কতই না গাল-গল্প চলতো। আমার বাবাকে দেখে তখন কে বলবে, এই সেই গুরুগম্ভীর, সদা অন্যায়ের প্রতিবাদকারী বিলেত ফেরত মনিবাবু ডাক্তার। টপিকের কোন মাথা মুন্ডু থাকতনা। বাবার কি উচ্চ স্বরে হাসি। তবে আমার কানে এখনো ভাসে বাবার সেই গুরুগম্ভীর গলা 'দেখ ভুটোপেটা, কখনও যেন না

শুনি তুই কোনো খারাপ কাজ করেছিস। তাহলে কিন্তু আমি তোকে খুনই করে ফেলব।' তৎক্ষণাৎ ছকাকাকুর সেই বিখ্যাত 'মা কালীর দিব্যি '। বাবার বন্ধুও কিন্তু বার বার আশ্বাস দিত 'নারে, তোকে আমার জন্য লজ্জা পেতে দেবনা।' যদিও এক দু বার যে এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি তা নয়, তবে বাবার সততা ও ছকাকাকুর তার বন্ধুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, ভালবাসা তাকে নিচে নামতে দেয়নি। একবার কিছু অর্থের প্রলোভনে বা কিছুটা দুষ্টু লোকের প্ররোচনায় ছকাকাকু তার প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে মিথ্যাচারের চেষ্টা করে। বাবা মর্মাহত হলেও ভেঙে পরেনি। বোধহয় তারও গভীর বিশ্বাস ছিল বন্ধুর ওপর। বাবা ডেকে পাঠায়। সেও আগের মতনই আসে। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল, অনেক রাত পর্যন্ত। আমরা শুধু শুনলাম 'ডাক্তার, আমাকে ক্ষমা কর। আমার মতিভ্রম হয়েছিল। তুমিই আমাকে বাঁচাও।' তখন প্রায় মধ্যরাত। ছকাকাকু চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। যেন কিছুই হয়নি।

আমার বিয়ের সময় ছকাকাকুর স্ত্রীর খুব কঠিন অসুখ করে। যমে মানুষে টানাটানি। বাবার সে কী ব্যকুলতা,কি করে ছকার বৌ কে বাঁচানো যায়। বাবা সব কাজ ফেলে রুগীকে নিয়ে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। এমনকি মাও বাবার এই কাজকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারেনি। বাবার সেই অসহায়তা, 'ছকার কি হবে? কি হবে?' বাবার একবার খুব কঠিন কার এক্সিডেন্ট হয়। বাঁচার কোন আশাই ছিলনা। মা বলতো, 'সবার প্রার্থনার জোরেই তোর বাবা বেঁচে গিয়েছিল।' আমিও এই কথাটা গভীর ভাবে বিশ্বাস করি। আমাদের বাড়ির সংলগ্ন যে কালীমন্দির ছিল, যেখানে সবাই আমরা রোজ প্রণাম করতাম। বাবাও নিচে চেম্বারে যাওয়ার আগে রোজ প্রার্থনা করত। ছকাকাকুর সেই বুক ফাটা আর্তনাদ 'মা কালী, তুমি ডাক্তার কে বাঁচিয়ে দাও। আমি ওর মৃত্যু দেখতে পারবনা।' ঐ আওয়াজ বোধহয় মাকালীর কানে পৌঁছে ছিল। তাই তো বাবার বন্ধু মাত্র ৫৮ বছর বয়সে চলে গেল, হার্টের অসুখে, সেই তার ছোটবেলার বন্ধু বিলেত ফেরত ডাক্তারের চোখের সামনে। বাবা অবশ্য তার বন্ধুকে বার বার সতর্ক করে দিত, ''খাওয়া দাওয়াতে লাগাম টান, নিয়ম করে ওষুধ খা। ভুটোপেটা, নাহলে তোর এই বিলেত ফেরত ডাক্তারও কিচ্ছু করতে পারবেনা।"

বাবাকে যখন ডাকা হল, বন্ধু তখন প্রায় শেষ, খাবি খাচ্ছে একটু বাতাসের জন্য। বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, ''আমাকে বাঁচাও ডাক্তার।" যেই মাত্র বাবা হাত ধরে বুঝতে পারল তার বন্ধু আর নেই, ছকাকাকুর সেই বন্ধু, বিলেত ফেরত ডাকতার চেয়ার থেকে পড়ে যায়, কয়েক সেকেন্ডের জন্য জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে। সেই বাবার প্রথম হার্ট অ্যাটাক। সেই সময় বন্ধুর বড় ছেলেই বাবাকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচায়, আর বাবার প্রাণ রক্ষা করে। ততক্ষণে বাবার সেই ভক্ত বন্ধু অনেক দূরের পথে যাত্রা করেছে।

"জীবনকে শ্রদ্ধা না করলে জীবন আনন্দ দেয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দের বিনিময়, জীবনদেবতার এই রীতি।''

— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু স্মৃতি
কিছু ভাবনা

আমার দেখা সত্য ঘটনা

পার্বতী মিত্র চক্রবর্তী, এফ ই ৩০৬

এই প্রসঙ্গে আমার একটা সত্যি ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। আমাদের কুমোরটুলির বাড়িটি তিনতলা বাড়ি হলেও নিচে চারটি ঘর। লোকজনেরা থাকে, প্রেস ভাড়া আছে। আর দুটো তলায় তিনটি করে কক্ষ বা ঘর। দ্বিতলায় আমার খুড়শ্বশুরমহাশয় থাকেন। সেখানেই তার পাশের ঘরেই গোকুলচাঁদ থাকেন। তিন তলার ওপরেও ওই তিনটি ঘর। আমার শাশুড়ি মা এবং জ্যেঠিশাশুড়িমা বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার জন্য পুজোর কটা দিন ওই তিনতলাতেই থাকেন। আমার কন্যা আমি ও আমার স্বামী রোজ সল্টলেক থেকে যাতায়াত করি। আর এই গরমকালে অনেক সময় ক্লান্তির জন্য প্রয়োজন মত কুমোরটুলিতে রাত্রিবাসও করি। এইবারে ২০১৪ সালে মে মাসে গোকুলচাঁদ পুজোয় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যা বললে সত্যিই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয। আমাদের পুজোর পালায় একদিন পড়ে ফুলদোল। সেদিন গোকুলচাঁদ ও রাধামাকে চাঁপাফুলের সাজে সাজানো হয়। ফুলের গহনা, সজ্জা, শুধু চারিদিকে ফুল আর ফুল। কিন্তু যে কোন ফুল দেওয়া যায় না। শুধুমাত্র চাঁপাফুল দিয়েই সাজানো হয় ফুলদোল। চারিদিকে চাঁপার গন্ধে ম ম করে গোটা বাড়ি। সেই ফুল দোলের পর রাত্রে লুচিভোগ খাওয়ার পর সবাইকে প্রসাদ বিতরন করে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এই রাত্রিবাস এর জন্য ব্যবস্থা করেছিলাম। তিনতলার কোনার ঘরে আমার স্বামীর জন্য নিচে বিছানা পাতা হয়েছিল। আর মাঝখানের ঘরে শাশুড়িমা এবং জ্যেঠিশাশুড়িমা আর তার পরের ঘরটিতে বাড়ির কয়েকজন মহিলার শোওয়ার ব্যবস্থা হল। আমি আর আমার কন্যা নিচে দ্বিতলায় জায়ের সঙ্গে ঘুমনোর ব্যবস্থা করলাম। পরের দিন সকালে আমার শাশুড়ি এবং জা যিনি বাড়ির সেজ গিন্নি, উপরে তিনতলায় কোনার ঘরে দেখলেন পাখাটা খোলা পড়ে আছে আমার স্বামীর পাশে। তারপর জানা গেল আগের দিন আমার স্বামী যে ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে দিয়ে পাখাটা লাগিয়েছিল তা যত্নপূর্বক লাগানো হয় নি। আর সেজন্যই মাঝ রাতে সেটি খুলে পড়ে। সবচেয়ে অবাক হওয়ার বিষয় যে পাখাটি আমার স্বামীর উপরে না পড়ে তার পাশে পায়ের সামনে এমনভাবে পাখাটি ছিল যে মনে হল যেন কেউ পাখা খুলে পাশে রেখে দিয়ে গেছে। এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা আমার আজও মেলেনি। আমার স্বামী রামকৃষ্ণমিশনের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। যাদবপুর থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ার এবং নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটির মাস্টার অফ ফিজিক্স। তার বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানে এটা সত্যই কুলোয়নি যে এমন ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারে। ভারি জিনিষ মাধ্যাকর্ষন শক্তির টানে অবশ্যই মাটিতে পড়বে। হয়তো গতিবেগ অনুসারে একফুট/ দেড়ফুট দূরেও পড়তে পারে কিন্তু গোটা সাড়ে পাঁচফুট দূরে কি করে পৌঁছল তার কোনো ব্যাখ্যা আজ অবধি উনি পাননি।

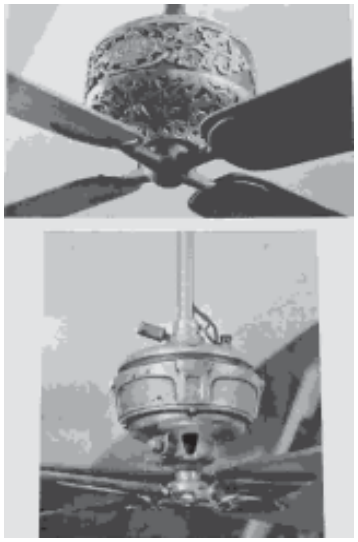

কিছু স্মৃতি
কিছু ভাবনা

তপন জ্যোতির আবির্ভাব মুহূর্ত

ভারতী রায়, এফ ই ২৮১

''আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখির গান।''

কবির জীবনের প্রথম উন্মোচন এইভাবে হয়। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই ছন্দ ও মিল কবিতা রচনার প্রথম পাঠ বলা যায়। সর্দার স্ট্রিটের বাড়িতে প্রত্যুষে উঠে জানলা খুলে সূর্যের প্রথম আলোর ঝলকানি তার মানসিক উত্তরণের দ্বার খুলে যায়। এই প্রতিফলন জীবনে প্রতিক্ষণে উপলব্ধি করেছেন ও নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। এই সচেতনা বিশ্বের দরবারে অন্যতম শিখরে উঠতে পেরেছিলেন। এই বিচারে বলতে হয়
'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারই হউক জয়।'

সূর্যের উদয় ও অস্তের দৃশ্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অবলোকন করা ও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা খুবই আনন্দদায়ক। গ্রাম, শহর, পাহাড় পর্বত, সমুদ্র এই ধরণীর সব প্রান্ত থেকে সুর্যোদয়ের প্রথম ঝলক ও সূর্যাস্তের মহিমময় রূপ নয়নাভিরাম হয়ে মুগ্ধ করে, নির্বাক করে দেয়।

আমার ছেলেবেলা কেটেছে পুকুর, ক্ষেত, জমি, ফসল ঘেরা গ্রামের বাড়িতে। প্রাত্যহিক জীবন শুরু হত সূর্যের প্রথম আলোর বিচ্ছুরণ কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে তা প্রত্যক্ষ করা। প্রথম পাঠের 'ভোর হলো, দোর খোলো, খুকুমণি ওঠো রে' বলতে বলতে পুকুর পাড়ে গিয়ে বসা ও প্রথম রশ্মির ক্ষেপণ দেখতে পাওয়ার আনন্দে মেতে থাকতাম। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হলেই মনটা দুঃখে ভরে যেত। পুকুরপাড় ধরে এগিয়ে বসে পুকুরের জলের তরঙ্গ মিষ্টি মধুর হাওয়ায় মাঠের ধানের শীষের দুলুনি দেখতে দেখতে প্রান্তিক রেখার মাঝ খানে প্রথম দর্শন পেয়ে খুব আনন্দে মেতে উঠতাম। মনে হল পুকুরের ঢেউয়ের মধ্য থেকে ধানের শীষের মধ্য থেকে গা ঝাড়া দিয়ে সূর্য উঠে পড়েছে। লাল গোলকপিণ্ড মুহূর্তের মধ্যে চারিদিক আলোকিত করে ফেলেছে। এর পরেই বাড়ি ফিরে মুখ হাত ধুয়ে প্রাত্যহিক কাজে মনোনিবেশ করতাম। বিভিন্ন ঋতুতে শীতের কুয়াশা, বর্ষায় মেঘের আড়াল থেকে, পাহাড়ের শৃঙ্গ থেকে এই আলোর বিচ্ছুরণ দেখতে খুবই আগ্রহী ছিলাম। ফলে উৎসুক্য মেটাতে বিভিন্ন জায়গায় দর্শক হতে পেরেছি। আমার মামাবাড়ি জলপাইগুড়ি শহরে। ফলে সেখানে যাওয়া ও থাকা খুবই সহজ ছিল। শহরের সুন্দর পিচ ঢালা রাস্তা ধরে কাক ভোরে শহরের প্রান্তে তিস্তা নদীর পাড়ে যেতাম। সেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয়ের প্রথম আলোর ঝলকানি কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় পড়ে সাদা বরফের চূড়া কেমন ঝলমল করে, দেখে বাড়ি ফিরতাম। মনে হত এই ঝলকানি আরও কাছে গিয়ে দেখব।

বেশ কিছুদিন পর সেই সুযোগ এলো। সেদিন ছিল বসন্ত পঞ্চমী। ফেব্রুয়ারি মাস। টাইগার হিলের উপর থেকে মেঘ মুক্ত আকাশের কোলে দাঁড়িয়ে এই স্বপ্ন সার্থক হল। উদ্বেগ ও অধীর ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে হঠাৎ করে আলোর বিচ্ছুরণ চারিদিক ঝলকিয়ে দিল। মনে হল বুঝি বা আমার নতুন জন্ম হল। স্বপ্ন সার্থক হল। নবীন আলোয় অবগাহন করলাম। এর কোনও বর্ণনা করা যায় না। ফিরে আসার পর আমার এক সম্মানীয় ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন কি দেখলে? উত্তরে বলেছিলাম, বর্ণনা করা যায় না। উত্তর শুনে তিনি আমায় ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, এই উত্তরই আশা করেছিলাম।

গ্রামের পরিবেশ ছেড়ে শহরে এসে জীবন যাপনের নানা

পরিবর্তন হয়। কখনও শান্তিনিকেতন আবার কখনও কলকাতা করে প্রায় একনাগারে বিশবছর কলকাতার বিখ্যাত ঘটনাবহুল ও জনবহুল রাস্তা জ্যাকারিয়া স্ট্রিটের ধনকুবের বিড়লা প্রাসাদ বাড়ির মুখোমুখি এক তিনতলা ফ্ল্যাটে বসবাস করতে থাকি। এইরকম জনবহুল রাস্তা খুব কমই আছে। সব শ্রেণীর জনসমাগমে রাত্রি-দিন মুখরিত থাকে। একদিকে সেন্ট্রাল এভিনিউ, মহম্মদ আলি পার্ক অন্য প্রান্তে নাখোদা মসজিদ। মহম্মদ আলী পার্কে দুর্গা পূজার সমারোহ ও সুখ্যাতিতে জনসমাগম হত। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা ছিল না। প্রতিবছর অতি সুষ্ঠুভাবে পূজা অনুষ্ঠান হত। কালীপূজাতেও খুব সমারোহ হত।

এই রাস্তার ওপরে বিখ্যাত নাখোদা মসজিদ। এই মসজিদে খুবই নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে নানা অনুষ্ঠান হয়। আজান দিয়ে সূর্যোদয় মুহূর্তকে জানানো হত। জনসাধারণ এই শব্দ শুনে প্রাত্যহিক জীবন শুরু করত। এই চওড়া রাস্তার ফুটপাতে সব ভবঘুরেরা রাত্রে ঘুমাত। বিরাট অট্টালিকার মাঝের ফাঁক দিয়ে আলোর ঝলকানিতে তারা জেগে উঠত। প্রতিদিনই এই সময় মসজিদের পীরেরা থালায় করে রসগোল্লার মত পনির এনে সব ভবঘুরের মুখে পুরে দিত। এই মানবিকতা দেখে আমার মন ভরে যেত। পূবের আলোর ঝলকানিতে আমিও দিন শুরু করতাম।

এরপর মহাসাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের লীলা খেলা দেখার সুযোগ হয়। পুরীর সমুদ্রের বিরাটত্ব ও তর্জন গর্জনের মধ্যে প্রকৃতির বৈচিত্র্য খুবই চমকপ্রদ। পাড়ে বসে আকাশছোঁয়া ঢেউয়ের তর্জন গর্জন মনকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। এই ঢেউয়ের উথাল পাথালের মধ্যে লাল টকটকে থালার মত সূর্য উপরে লাফিয়ে উঠেই আলো ছড়িয়ে দেয়। মনে হয় সমুদ্রে অবগাহন করে উপরে এসে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলো ছড়িয়ে জাগিয়ে তোলে। ঢেউগুলো স্বর্ণাভ হয়ে নাচতে থাকে। পাড়ে বসে আমাদের নাচতে ইচ্ছে করে। অনেকে প্রাণ মন খুলে সংগীত শুরু করে দেয়। নিকষ কালো ঢেউয়ের মাঝে লাল রঙের আলো মনের কোনে রঙের আগুন ছড়িয়ে দেয়। চোখকে মোহমুগ্ধ করে দেয়।

হিন্দুকুশ পর্বতমালা দিয়ে ভারতের উত্তর সীমান্ত গ্রথিত। দক্ষিণের শেষ সীমান্ত তিনটি সমুদ্র নিয়ে বেষ্টিত। কুমারিকা অন্তরীপ ভারতের শেষ প্রান্ত। যেখানে তিন দিক সমুদ্রবেষ্টিত হয়ে দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে। পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর এসে ভারত মহাসাগরে মিলিত হয়েছে। সমুদ্রপথে বিদেশি নাবিকরা অনায়াসে অবতরণ করেছে ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে নিজেদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। এই প্রান্তে মন্দির আছে এই মন্দিরে কুমারী মালা নিয়ে তার আরাধ্য দেবতার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তার সেই অপেক্ষা পূরণ হয়নি। ফলে চিরকুমারী মালা হস্তে দন্ডায়মান। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। সমুদ্র প্রতিদিন এই মন্দির ধৌত করে দেয়। নিত্য পূজো দিয়ে তার প্রতি সম্মান জানায়।

স্বামী বিবেকানন্দ এই কুমারিকাতে তাঁর পথনির্দেশিকা খুঁজতে যান। এই অন্তরীপ থেকে কিছুটা দূরে সমুদ্রের মাঝে পাথরের একটা বিরাট রক দেখে সে স্থান সাধনার জন্য বেছে নেন। ছোট মতো ফেরি জাহাজ করে সেই স্থানে যাতায়াত করা যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, এর শেষ কোথায়। শুধু জল আর ঢেউয়ের প্রাধান্য। আকাশ সমুদ্রে মিশেছে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত একই অবস্থান থেকে দেখে বিস্ময়ের অবকাশ থাকে না। স্বামীজি এইখানে মন্দির তৈরি করে সাধনায় মগ্ন হন। উন্মুক্ত রকে বসে প্রকৃতি অবলোকন করেন। শুধু জল আর জল। এর শেষ কোথায়...তাকে উতলা করে তোলে। এখান থেকে পথ নির্দেশিকা পেয়ে তিনি সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। এখান থেকে বিবেকানন্দের শেষ কোথায় দেখতে যাত্রা করেছিলেন।

এসব পরিক্রমা করে বঙ্গোপসাগরের পাড়ে অবস্থিত অতি পরিচিত উল্লেখযোগ্য শহর ওয়ালটিয়ার বা ভাইজাগ। শহর হিসেবে হোক বা নগর হিসেবে হোক অতি সুন্দর মনোরম জায়গা। এখানকার অধিবাসীরা খুবই ভদ্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সাগর পাড়ে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়। সমুদ্র পাশ থেকে গর্জন করে এসে পাড় ধুইয়ে দিচ্ছে। মনে অনেক স্বপ্ন উঁকি দেয়। মনে হয়,

'স্বপন যদি মধুর এমন
হোক সে মিছে কল্পনা'।

ভাইজাগে জাহাজ তৈরির কারখানা বিখ্যাত। ভাগ্যক্রমে ট্রেনে এক মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সঙ্গী হয়। তারই তত্ত্বাবধানে আমরা হোটেল মেরিনাতে একদম সমুদ্র পাড়ে জায়গা পাই। সমুদ্রের নানা লীলা খেলা দেখতে থাকি। জাহাজ তৈরির কারখানা একটি আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান। এই ইঞ্জিনিয়ার আমাদেরকে কারখানা পরিদর্শন করার সুযোগ করে দেয়। সাগর থেকে একটা ক্যানাল শহরের প্রান্তে ঢুকে পড়েছে। সেই ক্যানালের বিস্তৃত পরিধি নিয়েই কারখানা। খাঁচার মধ্যে জাহাজ তৈরি হয়। পুরো তৈরি হলে খাঁচার কাঠ সরিয়ে জাহাজকে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এখানে তারাতলাতেও এই পদ্ধতিতেই তৈরি হয়। আবার গ্রামেও নৌকা তৈরিতেও এই পদ্ধতি চলে।

হোটেলে এসে মনে হল সূর্যোদয় দেখতে হবে। হোটেলে যারা এসেছে তারা বিশ্রাম করে দিন কাটাচ্ছে। মনে হল এখানে তারা অভ্যস্ত। এখানে সার্ভিস ম্যানকে বলতে সে খুব আনন্দের সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিতে উৎসাহিত হল। ওদের কান্ডারীর বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। সেই ছেলেটি খুব আগ্রহ করে সব আয়োজন করার আশ্বাস দিল। আমরা বুঝতে পারছিলাম না কি করতে হবে, কিন্তু তারা আমাদেরকে এমনভাবে পরিচালনা করল তাতে আমরা খুব আনন্দ পেলাম। কারণ রাত তিনটে বেজেছে, বেহারা এসে দরজা নক করে আমাদেরকে ডেকে বারান্দায় চেয়ারে বসতে বলল। চা ও বিস্কুট টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে বসে থাকতে বলল। আমরা চা খেয়ে বসে থাকলাম। এই সময় জেগে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। আবার অজানা ভীতি মনকে ছেয়ে ফেলেছিল। গভীর রাত্রি। অন্যরা সব নিদ্রামগণ। যদি কোন অঘটন ঘটে তার জন্য জবাব দেবার কেউ জেগে নেই। তাই ঈশ্বর স্মরণ করে সমুদ্রের কালো জলের গর্জন ঢেউ দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ভারত মহাসাগর বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত দিয়ে জাহাজ আনাগোনা করছে। এই জাহাজ দেশ-বিদেশের পণ্য ও যাত্রী নিয়ে সমুদ্র সংলগ্ন দেশে পৌঁছায়। সিংহল এদের প্রধান গন্তব্য স্থান। সমুদ্রের মাঝে লাইট হাউজের আলো ফেলে পথ নির্দেশিকা দিচ্ছে। এইসব দেখতে রাতের অন্ধকারে খুবই রোমাঞ্চ লাগছিল। দেখতে দেখতে হঠাৎ লাইট হাউস ও সিংহল যাওয়ার পথের মাঝে একটা লাল সিঁদুরের টিপ ঘড়ির পেন্ডুলাম এর মত ঘুরছে। এখানে আকাশ যেন সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে। অন্যদিকে লাইট হাউস জাহাজের পথ নির্দেশিকার জন্য সার্চলাইট ফেলছে। এইসব অনেকটা সময় নিয়ে দেখতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল সিংহল কত কাছে।

এসব ভাবনার মধ্যে দৃষ্টি এক দিকে রেখে সময় কাটাচ্ছি। সব কিছু দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সিঁদুরের টিপটি সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে তাল দিচ্ছে। কিন্তু বড় হচ্ছে না বা সরেও যাচ্ছে না। কি করব ভাবছি। সাহায্য করার কেউ নেই। প্রায় দু'ঘণ্টা ওইভাবে চলার পর দেখি সেই বিন্দু বিরাট লাল গোল আকারে সমুদ্র থেকে উঠে এল। চারিদিকে আলো উদ্ভাসিত হল। বাকশক্তিহীন হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম।

চারিদিক আলোয় ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার দূর হয়ে আলোর ঝলকানি শুরু হয়েছে। আমাকে সম্মোহিনী করে ফেলেছে। এই ছবি অনেকদিন ধরে বয়ে বেড়াচ্ছি। আজ কিছুটা তুলে ধরতে পেরেছি বলে আনন্দ হচ্ছে। কোনটাই অতিরঞ্জিত নয়।

অনেক কবি লেখকদের রচনায় এই ছবি নানাভাবে ফুটে উঠেছে। অনেক প্রকৃতি প্রেমিক এই দৃশ্য দেখার জন্য নিউজিল্যান্ড গিয়ে আনন্দ পায়। জানিনা সেখানে এর চেয়ে কত বেশি আনন্দ দেয়। এখানে যখন পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যায়, তার সৌন্দর্য অনেক দৃষ্টিনন্দন হয়। তার অভিব্যক্তি

''সূর্য ডোবার পালা
আসে যদি আসুক বেশ তো
গোধূলির রঙে হবে এ ধরণী স্বপ্নের দেশ তো
বেশ তো। বেশ তো।''

কিছু স্মৃতি
কিছু ভাবনা

রীনপুচির আশীর্বাদ

আশিস সরকার, এফ ই ২০৩

গাড়িটা ধীরে ধীরে একটা মল মতন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা ওপেন এয়ার দোকান। নিচে কয়েকটা বড় বড় বাড়ি দোকানপাট। আমি ট্যাক্সি থেকে নেমে টাকা মিটিয়ে দিলাম। সঙ্গের সহযাত্রী এক মহিলা আমাকে নিচে বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। এখান থেকে উপরে পাহাড়ের টিলার উপর একটা চৈত দেখা যায়। অনেক রং বেরং এর ধর্মপত্র দিয়ে সেগুলো সাজান। তার পাশে একটা পুরানো তিব্বতী ধরনের বাড়ি। শুনলাম ওখানেই ব্যাঙ্কটি। আমি আস্তে আস্তে নেমে চৈতটাকে পাশ কাটিয়ে ঐ বাড়িটার কাছে গেলাম। ভিতরে কজন স্টাফ কাজ করছিল তারা আমাকে ডেকে নিল।

ব্যাঙ্কে কাজ করি। আফিসের কাজে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। সেই রকম এই জায়গাটায় এসেছি। খুবই নিরালা জায়গা। নানারকম অর্কিড ক্যাকটাসের জন্য বিখ্যাত। আদা বড় এলাচ এখানকার ফসল। আমাকে থাকবার জন্য ঐ ব্যাঙ্কের উপর তলায় ব্যবস্থা হয়েছে। দেখলাম বহুদিনকার পুরানো দুর্গের মত বাড়ি। খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে। কাঠের প্যানেলিং দেওয়া ঘর। সামনের বারান্দা মতন জায়গায় দাঁড়ালে মন ভরে যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া ঝকঝক করে। একটা নদী নেমে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। পাহাড়ের ঢালুতে রাই সম্প্রদায়ের গ্রাম/ ক্ষেত। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। নিচের দিকে একটা বিশাল বাড়ি। ওটা এখানকার প্রাক্তন শাসনকর্তার বাড়ি। মাথার উপর একটা পাইনের বন। তার পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল মনষ্ট্রি। শুনলাম কিছুদিন আগে একজন রীনপুচি ওখানে মারা গেছেন। আর কদিন পরে তার অন্তেষ্টি উৎসব। (রীনপুচি হোল বুদ্ধিষ্ট্ সমাজের একজন সর্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্ত লামা বা সাধু। যাকে জীবন্ত বুদ্ধও বলা হয়। তখন তাঁর বয়স ১২৯ বছর হয়েছিল। তিনি তার মৃত্যুর কথাও ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে কোথায় জন্মাবেন, তাও তিনি নাকি ঘোষণা করে দিয়েছেন কাউকে নাকি আশীর্বাদও করবেন।) এই প্রায় পঞ্চাশ দিন ধরে সারা সিকিম থেকে তাকে শেষ দেখতে লোকজন আসা যাওয়া করছে। সেইজন্য আসবার সময় দেখছিলাম এত গাড়ি উঠা নামা করছে। অফিসের স্টাফদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলাম দুদিন পরে ছুটির দিনে ঐ রীনপুচিকে দেখতে যাব।

রাত্রে কাঠের ঘর হওয়াতে তেমন ঠান্ডা লাগল না। ঘুমের মধ্যে খালি মনে হচ্ছিল একজন অতি শীর্ণকায় লামা আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন। আবার মনে হল কজন তিব্বতী পোষাক পরা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। কিছু ভাবলাম না। পরদিন অফিসে কাজ করলাম। রাত্রে আবার সেই লামাকে স্বপ্নে দেখলাম, হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। পরদিন ছুটি। অফিসের সবার সঙ্গে চললাম সেই মনষ্ট্রিতে। পাহাড়ের একদম মাথায় ঐ গুম্ফা। বাইরে কয়েকশ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হাজার লোকের ভীড়। লাইন করে ছোট পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠলাম। একটা ছোট ঘরের মধ্যে রীনপুচিকে রাখা হয়েছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে একজন একজন করে এই ঘরে লোক ঢুকতে দিচ্ছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলাম একটা স্বর্ণখচিত কাঠের বাক্সে রীনপুচিকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। কয়েকটি প্রদীপের মৃদু আলো জ্বলছে। পাইনকাঠের ধূপের গন্ধে একটা স্বর্গীয় ভাব ফুটে উঠেছে। রীনপুচিকে একটা হলুদ রঙের সিল্কের কাপড়ে ঢেকে রেখেছে, খালি মুখ খোলা। মুখ দেখে আমি চমকে উঠলাম ! এত গত দুদিনের স্বপ্নে দেখা লামা। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। হঠাৎ রীনপুচির মুখে হাসি দেখতে পেলাম। একটা হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে বলে

উঠলেন শুভমস্তু। তারপরই আবার পুরানো অবস্থায় ফিরে গেলেন। মুখের ঔজ্জ্বল্য চলে গেল। ঘরে থাকা দুজন প্রবীন লামা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ঘরের বাইরে এনে আমাকে সবাইকে দেখিয়ে সিকিমিজ ভাষায় কিছু বলতে থাকলেন। বুঝ লাম রীনপুচি যে আশীর্বাদ করেছেন তাই বলতে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে লাইনের লোকেরা হৈ হৈ করে উঠল। একটু পরে নিচে কাড়া নাকাড়া ড্রাম বাজতে লাগল। আমাকে নিচে নিয়ে একটা মঞ্চের মত জায়গায় উঠানো হোল। সবাই দেখি আমাকে খদা (সম্মানী) দিতে থাকল। দেখলাম লোকজন আমাকে নমস্কার করতে লাগল।

এই উৎসব থেকে প্রায় দুঘন্টা পরে ছাড়া পেলাম, বিশাল এক বিদেশী গাড়িতে আমি ফিরে এলাম।

এর তিনদিন পরে রীনপুচির অন্তেষ্টি হোল। সারা সিকিমে ছুটি ঘোষণা করা হোল। হাজার হাজার লোক উৎসবে এল। আমাকে সিকিমিজ পোষাক পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোল। সিকিমের চোগিয়ালের মেয়ে আমাকে খদা পরিয়ে দিলেন। সবাই অনেকে আমার ফটো নিল। সংবাদপত্রের সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকার নিল। মোটামুটিভাবে আমি ভিআইপি। এর দুদিন পরে আমার কাজ শেষ হয়ে গেল। আমি রীনপুচির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলাম। কয়েক বছর পরে আমি আবার ঐ জায়গাটায় গেছিলাম। দেখি ঐ মনষ্ট্রির পাশে বিরাট স্তুপ করা হয়েছে। এক দিকে দোকান পাট। অন্যদিকে চমৎকার একটা ফুলের বাগান / হোটেল / রেস্টুরেন্ট। বহুলোক আসছে স্তুপকে সম্মান জানাতে। দেখলাম এক কিনারে রীনপুচির ফটো। ধূপকাঠি / নানারকম টোকনের সঙ্গে আমার ছবিও বিক্রি হচ্ছে।

"শরীরকে সুস্থ অবস্থায় রাখা একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তা না হলে মনকে সবল ও সুস্থ রাখা যায় না এবং জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত থাকে না।"

— ভগবান গৌতম বুদ্ধ

কিছু স্মৃতি
কিছু ভাবনা

হারিয়ে পাওয়া

শুভ্রা রায়চৌধুরী, এফ ই ৩৫২

জীবনের একটা সময় দাঁড়িয়ে সব মানুষই বোধ হয় বারবার পিছন দিকে তাকায়। একটু বোধহয় ভুল বললাম — সব মানুষ না হয়ে কথাটা বোধহয় কোন কোন মানুষ হবে। সকলেই কি আর আমার মত পিছিয়ে যেতে চায়। বড্ড পুরানো কে ভালোবাসা মানুষ আমি। ভীষণভাবে পুরাতনে বাঁচি। কিশোরী কালেও তাই-ই ছিলাম। এখন তো আরও বেশি...। কত কিছুই তো হারিয়ে যায় জীবন থেকে। কত নামিদামি দ্রব্য, বিষয়-আশয়, সম্পত্তি, সম্পর্ক এমনকি সন্তান হারিয়ে যায় জীবন থেকে। প্রতিটি হারানো জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ থাকে। হঠাৎ ভেসে আসা বাদলের হাওয়ার মতো সেই গন্ধ এসে ঝাপটা মারে।

মনোজগতে তখন সেই সব দিন। সেই দুই বিনুনি করা রোগা রোগা চেহারার একটি মেয়ে। স্কুলের বটলগ্রিন স্কার্ট উড়ে আসে পাখির মত। নাটাই মঙ্গলচন্ডী, পুন্নিপুকুর এরকম কতো ব্রত, পুতুলের বিয়ে সবকিছু ঢেউয়ের মতো উঠে এসে আবার মিলিয়ে যায়। একান্নবর্তী পরিবারের আলো-আঁধারি দিন। উঠোনে ছক কেটে চুকিৎকিৎ। মাটি দিয়ে পুতুল বানিয়ে ঝাঁটার কাঠি দিয়ে তার চোখমুখ নাক আঁকা। একটা আলাদা ছোট্ট মাটির গোল্লা বানিয়ে সেটা মেয়ে পুতুলের মাথার পেছনে খোঁপা হিসেবে থেবড়ে আটকে দেওয়া, তারপর সেগুলো রোদ্দুরে দিয়ে শুকিয়ে আরও শক্ত পোক্ত করার জন্য রান্নাঘরের জোড়া উনুনের মাঝখানের সেতুতে রেখে আসা। জেঠিমা বা মাকে বলে আসা মাঝে মাঝে যেন সেগুলো উল্টেপাল্টে দেয়। পরিত্যক্ত নারকেলের মালা, আধলা ইঁটের উপর বসিয়ে চুন, সুরকি, বালিতে জল মিশিয়ে রান্নাবাটি। ছোট গাছের গোল গোল পাতাকে লুচি বানিয়ে, বুনো ফুল, ফল দিয়ে রান্না করা। আমার আর ফুলির রান্নাবাটি খেলা। ফুলি আমার কাকার মেয়ে। আমার খুব বন্ধু। মাটির পুতুল সোঁদা গন্ধ নিয়ে আমার মন ভোলায়।

সন্ধ্যাবেলা হরির লুটের বাতাসা...সাদা ধবধপে টিকালো নাক, কপালে বড় একটা চন্দনের টিপ বড় ঠাকুমাকে খুব স্পষ্ট দেখতে পাই আজকাল। আমরা জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাই-বোনেরা কুড়ানো বাতাসাতেই যথেষ্ট খুশি। মনে পড়ে একবার মেজ জেঠু মাংস রান্না করেছিল। উঠোনের একধারে ইঁট দিয়ে তাতে মাটি লেপে বেশ বড়সড়ো একটা উনুন বানানো হলো। তারপর উনুনে ইয়া বড় একটা হাঁড়িতে মাংস রান্না হল। তখন অত বড় হাঁড়িকে আমরা 'ড্যাগ' বলতাম। উঃ মাংসের কী গন্ধ! সেই গন্ধ এখনো পাই। সেই স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। মা, জেঠিমা, কাকিমারা উঠোনেই কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে আর বাগানের কলাগাছের কলাপাতা নিয়ে এসে খাবার জায়গা করে দিল। বাড়ির রান্নাঘর থেকেই ভাতের সাপ্লাই এসেছিল। আমরা তখন বেশ ছোট। কী যে আনন্দ হয়েছিল তা বলে বোঝাবার নয়। মেজ জেঠুর মুখে যুদ্ধ জয়ের হাসি।

আচ্ছা স্পর্শ করতে না পারাটাই কি হারিয়ে যাওয়া? কি জানি...আমি তো আজও এদের নিয়েই থাকি। বাদল দিনের বাতাসের মতন, নবান্নের ঘ্রাণের মতন ঢেউ হয়ে ভেসে আসে এরা। বহু বছর আগে মেজ জেঠু চলে গেছে। কিন্তু আজও আমার কান তার সেই 'খুকুমনি' ডাকটা শুনতে পায়। যেমন এখনো শুনি বাবা ডাকছে, 'খুকু রে...'

চলার পথে জীবন থেকে আমরা অনেক অনেক কিছু কুড়িয়ে পাই। সেগুলোকে ভালবাসি। যত্ন করি। মায়ায় জড়িয়ে থাকি। মায়ায় জড়িয়ে রাখি। তবুও বিষন্ন মেঘলা দিনের মতো শূণ্যতা নেমে আসে কখনো কখনো। পড়ে পাওয়া ষোল আনার থেকে চোদ্দো আনা স্মৃতি হয়ে যায়। এটারও

দরকার আছে বটে। নয়তো আমরা মূল্যহীনের তালিকায় ফেলে দিতাম সব পাওয়াগুলোকে। বুকের ভেতর কষ্টগুলো হারমোনিয়ামের রিড হয়ে থাকে। নির্জনে, নিরালায় সেগুলো বেজে ওঠে শত সুরে। এক জীবনে এটুকুই পাওয়া আমাদের।

সারাটা জীবনই বুকের মধ্যে ছোটবেলা নিয়ে ঘুরি আমরা। সেই সময় কালই হল জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। সকালের শিশু আলো যেরকম মিঠে হয়। আমাদের ছোটবেলাগুলোও হাজার দুঃখ কষ্ট ও না পাওয়া সত্ত্বেও সেই শিশু আলোর মতোই মিঠে।

নির্জন দুপুরে কিংবা বিষন্ন গোধূলিতে আমি আমার ছোটবেলাকে ডেকে এনে পিঁড়ি পেতে বসাই। কোনও দমকা হাওয়ায় খুলে যায় সমস্ত কপাট। হারানো রূপকথারা জেগে ওঠে। গুপ্তধনের মতন জ্যোতি ছড়াতে থাকে। ঝ লমল করে ওঠে ক্লান্ত মন। অগ্রহায়নের আমনধানের সুবাসের মতন, নবান্নের নব অন্নের স্বাদের মতন কিশোরীবেলা ফিরে আসে এক লহমায়। ফিরে আসে গোয়াল ঘরে কমলি, পুকুরে সাঁতার শেখার সময় খিমচি দিয়ে বাবার হাত ধরে থাকার দৃশ্য, ছোট ঠাকুমার ঘরের পাশে হুড়োহুড়ি করে জাম কুড়ানো, কালবৈশাখীর পর আম কুড়ানো, বর্ষায় লণ্ঠনের আলোয় ঘরের দেওয়ালে ছায়া নৃত্য।

গোপন কুঠুরির গুপ্তধনের বাক্স খুলে যায়। সমস্ত ধনরত্ন ছড়িয়ে পড়ে। মনের আঙিনা দুধ জ্যোৎস্নায় ভেসে যেতে থাকে তখন। জীবনের যা কিছু হারিয়ে যায় সব — সব কিছু ফিরে পাই তখন। দেওয়া নেওয়ার হিসেব রাখতে ভালো লাগে না। কি পেলাম, কি পেলাম না, কতটুকু পেলাম এসব ফুৎকারে মিলিয়ে যায়। স্বপ্নের মত কেটে যাওয়া দিনগুলো হারিয়ে যায়। তখনকার কিশোরী এখন দিন শেষের রোদ ছুঁই ছুঁই। কিশোরীর ছায়া, মায়া হয়ে রয়ে গেছে। এখনো সে আগের মতোই বৃষ্টির গন্ধ পায়। বৃষ্টির ফোঁটা শুকনো মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রাকৃতিক এসেন্স ছড়িয়ে পড়ে। বুক ভরে আজও শ্বাস নেয় সেই মেয়ে। মাছরাঙার ডাক শুনে বোঝে মেঘ জমবে এবার। বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি নামবে আকাশ সিঁড়ি ভেঙে। সেই মেয়েটাই আবার শীতল কুয়াশা ভোরে বারুদ গন্ধ খুঁজে পায়। ভেসে ওঠে মনের মধ্যে ফ্ল্যাশব্যাকের মত। কুয়াশা, গাছপালা, জ্যোৎস্না, বাড়ির ধানের গোলা, তিলের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু, চিঁড়ের মোয়া, খইয়ের মোয়া, পুকুরের মাছ সঙ্গে কলমী আর শাপলার যুগলবন্দী ...এসব তাকে এখনো আবিষ্ট করে রাখে।
অনেকের কাছে এসব বড় অদ্ভুত লাগে। সে লাগুক। তাতে তার কিছু এসে যায় না। যার কাছে যেটা ভালো লাগে, সে তো সেভাবেই দেখবে। বেলা শেষে ক'জন স্পষ্ট দেখতে পায় বল?

সিনেমার দৃশ্যাবলীর মতন একের পর এক ভাসতে থাকে আমাদের বাড়ি, ছোটঠাকুমার উঠোন, ছোট কাকার পাঠশালা, পুকুরপাড়ের বাঁধানো ঘাট যার দুপাশেই রঙ্গন গাছগুলো সাদা-লাল -গেরুয়া ফুলে সেজে ফুলশয্যার নববধূর মত লাজুক দৃষ্টি মেলছে। সুরেলা বাতাসের তালে তালে দুলছে জাম আম নারকেল গাছের পাতা।

আর একজনকে আমি সব সময় পাই। আমার অনুদি। মেজ জেঠুর মেয়ে। চোখ বুজলেই দেখি সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুর দালানে বসে উদাত্ত স্বরে গাইছে—

''যে ধ্রুবপদ দিয়েছো বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবন গানে।''

হ্যাঁ — পাই, হারায় না কিছুই। আমি সব ফিরে পাই।